ফসল দেশি

হরপ্পা লিখন চিত্রণ অক্টোবর ২০২০ সংখ্যায়
প্রকাশিত ছ'টি নিবন্ধের ই-বুক সংস্করণ

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২৪ আশ্বিন ১৪৩১ (ইং ১০ অক্টোবর ২০২৪)
মহাসপ্তমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হল
'রূপং দেহি'

সম্পাদনা
সৈকত মুখার্জি

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

গত ২০২০ ছিল এক সংকটকাল। ওই বছরের মার্চের শেষে গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে যায়, নিশ্চল হয় রেলের চাকা, বন্ধ হয় উড়োজাহাজের উড়ান, অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ জনজীবন হয়ে পড়ে স্তব্ধ। রাস্তায় বেরোলে মুখে বাঁধতে হত মুখোশ। রুজিরুটি বন্ধ হওয়ায় নিরাপত্তার তাগিদে নিজেদের ভিটেতে ফিরে আসতে থাকে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে-থাকা মানুষেরা। পথে বাস-ট্রেনের তলায় পড়ে মৃত্যুও হয় ক্লান্তিতে ডুবে-থাকা অনেকেরই। আবার অনেকেই তাদের কল্পিত নিরাপদ আশ্রয়ে এসে আপদে পরিণত হন, তাই পুনঃমুষিক ভব—এ সূত্র মেনে ফিরে যান অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে কর্মসংস্থানের ইঁদুর

দৌড়ে। তাঁদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না, যেমন ছিল না মোমবাতি-জ্বালানো, থালা-বাজানো নাগরিকদের, যাঁরা নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ে কর্তব্যসম্পাদন করলেও কমেনি করোনা দাপট, দিন-দিন তা অঙ্কের নিরিখে বেড়েছিল। আর এই ফাঁকে গ্রীষ্ম-বর্ষা বিদায় নিয়ে এসেছিল শরৎ। শিউলি ফুটে ছিল, হিম-হিম সকালে প্রতি বছরের মতো ঘাসের আগায় চকচক করত শিশির, নদীর ধারে কাশবনেও দোলা লেগেছিল। এসেছিলেন দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাও।

কিন্তু সবাই দ্বিধায় ছিলেন—ওই অর্থনৈতিক দোলাচলে, সংক্রমণের ঘনঘটায় পুজো করা উচিত হবে কিনা। না পুজো হয়েছিল। যেমন হুতোম বলেছিলেন— "বার জন একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—"। অথবা পাড়ায় কোনো অঘটন ঘটলে মাতব্বর গোছের কিছু লোক বারোয়ারি রক্ষেকালী পুজো করেন—দোরে-দোরে ঘুরে চাঁদা তুলে। তবে ওই পুজোর আয়োজন কিংবা থালা বাজিয়ে বা প্রদীপ জ্বালিয়ে রোগ তাড়ানো কোনো দৈবসূত্র নয়। দুর্গাপুজো আপামর বাঙালির কাছে যতটা-না ধর্মীয় অনুষ্ঠান তার থেকে অনেক বেশি মিলনের উৎসব। তার থেকেও অনেক বেশি বহু মানুষের অর্থনৈতিক উপার্জনের মূলসূত্র। পুজো শব্দটা সঙ্গে বাঁধা থাকলেও সেখানে সাম্প্রদায়িক বাড়াবাড়িটা কম। পুজোয় যেমন সকলেই সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দেন, তেমনি অংশও নেন মন খুলে।

শারদোৎসব আমআদমির কাছে একটা যজ্ঞও বটে। মন্ত্রতন্ত্র কতটা তা-তে আছে না-জানলেও বলতে পারি এ যজ্ঞ

জঠরের যজ্ঞ। এই পুজোর দিকে তাকিয়ে বছরভর বসে থাকে বহু মানুষ। সারা বছর টুকিটাকি রোজগারের উপায় থাকলেও পুজোর সময়ের উপার্জনই হল তাদের বলভরসা। যেমন গোটা বছরধরে নানা প্রতিমার বায়না নিলেও, কুমোর চিটমাটি আর বেলেমাটিতে খড় বা পাট মিশিয়ে নিজের শিল্পদক্ষতার শীর্ষে পৌঁছতে চান মহাপুজোর মরশুমে। সারা বছর টুকিটাকি সেলাই করে অনলাইন আর রেডিমেডের যুগে সংসার-টানা পাড়ার দরজি ভরসা রাখেন পুজোর অর্ডারেই। এভাবেই প্যান্ডেল-ডেকরেটার, ফুটপাতের হকার, প্রসাধনবিক্রেতা, পার্লারের মালিক সকলেরই অর্থনৈতিক দুর্গতিনাশিনী যেন এই উৎসব। এমনকি যে-ছেলেটা রোজ সকালে বাড়িতে-বাড়িতে কাগজ দেয়, সে-ও ভাবে একটা পুজোবার্ষিকী যদি গুঁজে দেওয়া যায় খবরের কাগজের সঙ্গে, তবে পার্বণের সময়ে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হয়।

এমনই অর্থবহ এবং অর্থ-বাহী উৎসব কোনো বছর না হলে কী হতে পারে তা সংবেদনশীল পাঠক অনুমান করুন। 'নিউ নরমাল'-এ মানিয়ে নেওয়া নাগরিককুল অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে সেবছর তাই পুজো করেছিল— সেকথা অবশ্য সবারই জানা।

সে সংকটকালে দুর্গতিনাশিনীর উদ্‌যাপনকে স্মরণ করতে প্রকাশিত হল 'হরপ্পা লিখন চিত্রণ'-এর অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সংখ্যা থেকে গৃহীত ছ'টি নিবন্ধের বৈদ্যুতিন সংস্করণ 'রূপং দেহি' শিরোনামে। নিবন্ধগুলিতে সংকলিত হয়েছে ওই সংকটকালে ছ'জন বিশিষ্ট শিল্পীর পূর্ব অভিজ্ঞতা

এবং কীভাবে তাঁরা ওই সংকটকালে দেবীবন্দনার আয়োজনে বহু মানুষের জীবিকার সুযোগের সূত্র খুঁজছেন।

সেসংকট আমরা অতিক্রম করলেও কাটেনি পৃথিবীর গভীর অসুখ। তাই আবার আজকে আমরা ফিরে দেখতে চাইছি। ব্যাধিনাশিনীর কাছে প্রার্থনা করছি—সকলে সুস্থ থাক, শান্তি বর্ষিত হোক চরাচরে—

রূপং দেহি
যশো দেহি...
দ্বিষো জহি

পার্থ দাশগুপ্ত ৯
সনাতন দিন্দা ১৮
সুশান্ত পাল ৩০
ভবতোষ সুতার ৪৪
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫৪
আশিস ঘোষ ৭২

পার্থ দাশগুপ্ত

পুজো তো পুজোই। তার আচার আছে, উপচার আছে, পৌরহিত্য আছে, সেবাইত আছে। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ, সালতামামির পুস্তিকা আছে। বিধির বিধান আছে। এসব মেনেই চারদিনের মহাকলরব। এসবের নড়চড় হয় না। যদিও কিছুদিন আগে লক্ষ করা যাচ্ছিল যে পুরোহিতের আকাল। যাঁরা আছেন তাঁরা অধিকাংশই বয়স্ক। গুটিকয় তন্ত্রধারক পাওয়া যাচ্ছিল অল্পবয়সি। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে পুরোহিতের বৃত্তিটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক শোনাচ্ছিল না। তবে দিন পালটায়। প্রয়োজন পালটায় বা নতুন করে নির্ধারিত

বকুলবাগানের পুজোয় কর্মরত লেখক (১৯৯২)

হয়। সেরকমভাবেই দেখা গেল যে, দেশের থেকে বিদেশে পুরোহিতের চাহিদা অনেক। 'যেখানেই একাধিক বাঙালি জড়ো হয় সেখানেই একটা দুর্গাপুজো হয়'— এই আপ্তবাক্যটা সঠিক বটে।

ক্রমে সেসব পুজো বড়ো হয়, আর প্রয়োজন পড়ে পুরোহিতের। এটা টের পেয়েছিলাম ২০১৬-১৭-তে। তখন আনন্দউৎসবের জন্য খানতিনেক পুজোর তথ্য-দেওয়া বিজ্ঞাপন বানাচ্ছিল কলকাতার এক বিজ্ঞাপন সংস্থা। ঘটনাচক্রে সেই তথ্যচিত্র নির্মাণের পরামর্শদাতার কাজ সামলেছিলাম। তখনই বলাগড়ে এক পুরোহিত-কর্মশালায় হাজির হই। খোঁজ দিয়েছিলেন গুপ্তিপাড়ার সুজিত মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। তাঁরই পরিচালনায় সেই কর্মশালা হচ্ছিল এবং সেখানে একেবারে তরুণ

বিবেকানন্দ পার্ক এথলেটিক ক্লাবের পুজোর চালচিত্র আঁকছেন লেখক (২০১৪)

প্রজন্মকে অংশ নিতে দেখি। বুঝেছিলাম বিদেশি মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান এই অংশগ্রহণের হেতু। বিদেশবিভুঁইয়ে কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ সার্টিফিকেট খুব কার্যকরী। এবং এর জন্যই মায়ের পুজো, বাবার পুজো, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠানে পৌরহিত্যের ছাড়পত্র মিলবে। পুজোপাঠের 'অথরিটি' হওয়ার জন্য এই ধরনের স্বীকৃতিপত্র খুবই কাজের।

আগে কী হত, চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জেরা যজমানি করতেন বংশপরম্পরায়। দিন পালটেছে। পুরোহিতের ছেলে আর যজমানের ছেলে একই সাথে একই স্কুলে পড়ে। তাই পুরোহিতজ্ঞানে ওই সহপাঠীকে ভাবা একটু মুশকিলের। বে-পাড়ায় সে-ঝামেলা নেই। সেখানে কেউ কাউকে চেনে না। তাছাড়া দক্ষিণাও মেলে হাত ভরে। ক্রমে ঠাকুরদেবতার

এস বি পার্কের পুজোয় কর্মরত লেখক (২০১৮)

ওপর মানুষের দখলদারি শুরু হয়। একে-একে স্থানমাহাত্ম্য, নামমাহাত্ম্য, বর্ণমাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় কৌলীন্য অর্জন করে। যেমন ঠনঠনিয়ার কালী, আদ্যাপীঠের কালী; ফাটাকেষ্টর কালী বা অমুকবাবুর দুর্গাপুজো; সাদা কালী, নীল দুর্গা—এরকম। অজস্র উদাহরণ আছে। ক্রমে দেবদেবীরা কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলেন। তাদের বিধিসম্মত বাহন থাকা সত্ত্বেও বিবিধ বাহনরা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। এইখান থেকেই মনে হয় 'অথরশিপ'-এর প্রশ্নটা উঁকি দিতে শুরু করল।

শুরুতে কলকাতার দুর্গাপুজোর দুটো দিক ছিল। এক ছিল তাঁবেদারি, আর পাশাপাশি ছিল নবজাগরণের ডাক। সর্বজনীন

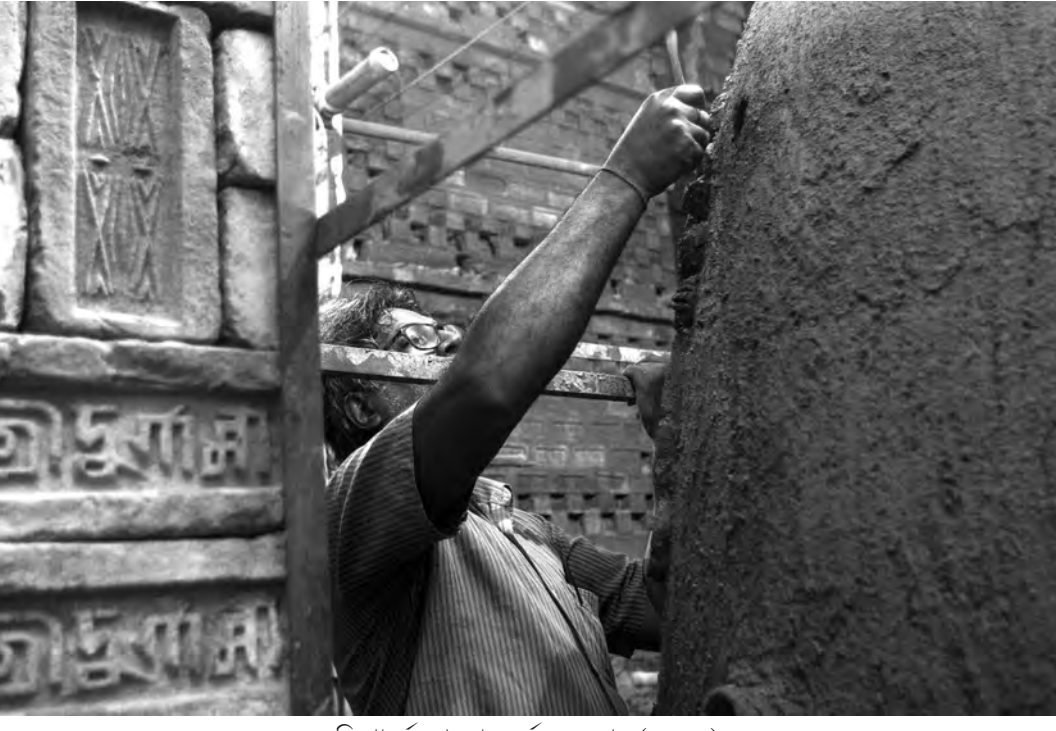

এস বি পার্কের পুজোয় কর্মরত লেখক (২০১৮)

রূপ পাওয়ার থেকে শুরু করে আশির দশকের শুরু অবধি প্রধানত পাড়ার লোকজনরাই কাঁধ মিলিয়ে পুজোপালন করত। আশির দশকের মাঝামাঝি পুরস্কারের আওতায় চলে এলো পুজোগুলো। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা ঝুঁকল পুজোর কাজে। এইবার একটু-একটু করে গোল বাঁধতে লাগল।

একটা ধাঁধা রয়েই গেল—এ পুজোটা কার? ক্লাবের, সমিতির না শিল্পীর? এই প্রশ্ন দীর্ঘকাল ধরে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে মাথায়। ২০১৩-তে ললিতকলা একাডেমির একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম একথা। মনে হয়েছিল যে, এখনও যেহেতু পুজোর 'পোস্ট প্রোডাকশন' বলে কিছু করা হয়নি সেরকমভাবে, তাই 'অথরশিপ'-এর জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। কলকাতার সংঘ-সমিতি পুরস্কারের মোহেই মাতোয়ারা। তাদের, এই সেদিন

এস বি পার্কের পুজোয় কর্মরত লেখক (২০১৯)

অবধিও, 'পোস্ট প্রোডাকশন' নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। গুটিকয় সংঘ তাদের অতীতকথা গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তা-তেও ধারাবাহিকতা নেই। পাশাপাশি খুব কমসংখ্যক শিল্পীরাই তাদের করা কাজের সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করেছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে একথা বলছি, কারণ এই সেদিনও প্রয়োজনে গুটিকয় শিল্পীছাড়া অধিকাংশই প্রয়োজনমাফিক তথ্য পেশ করতে সক্ষম ছিলেন না। অনেকে তো এর প্রয়োজনের কথাও বুঝতেন না। দীর্ঘসময় এই বিষয়ে কাজ করার ফলশ্রুতি থেকেই আমার এই ধারণা হয়েছে। যার ফলে ২০১২-তে আমার পুজোর কাজ নিয়ে একটি প্রামাণ্য বই তৈরি করেছিলাম। ক্যাটালগের মতো। তারপর নিয়মিত তথ্যচিত্র এবং বই বানিয়ে চলেছি এই বিষয়ে। সুশান্ত পালও নিয়মিত তথ্যচিত্র তৈরি করত।

ক্লাব এবং শিল্পী উভয়ের ঔদাসীন্যই কিন্তু 'পোস্ট প্রোডাকশান' হতে দেয়নি। যতই 'ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট' 'কার্নিভাল'—এসব তকমা দেওয়ার চেষ্টা করি-না কেন, 'ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট' হয়ে উঠতে যে-কৃতকর্ম লাগে তার কণামাত্র নিদর্শন আমরা গতকাল অবধি করে উঠতে পারিনি।

এরকম চলতে-চলতে হাজির হল অতিমারি। পুজোপালনের রীতিপদ্ধতিতে ছাপ পড়ল তার। এদিকে তো কর্মকর্তা আর শিল্পীদের মনে ছটফটানি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য শুরু হল অনলাইন আড্ডা। যে-আড্ডাগুলো শুধু কথাবার্তায় ভারাক্রান্ত। 'ভিজুয়াল আর্ট'-এর আলোচনা, পুজোর অতীত বা সাম্প্রতিক অতীতচারিতার 'ভিজুয়াল এভিডেন্স'-এর অভাবে পাংশু। আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়ে গেল গুটিকয় মানুষের মধ্যে। এবং এসব কিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল তথ্যসংরক্ষণের মূল্য। মনে রাখতে হবে আবার,এই পুজো নিয়ে মুখোমুখি আলাপ শুরু করেছিল কলকাতার এক আর্ট গ্যালারি—মায়া আর্ট স্পেস। সেখানে আমরা যারা সরাসরি পুজোর কাজ করি আর শ্রোতারা, প্রতিবারের পুজো নিয়ে আলোচনা করতাম এবং কাজের ছবি পেশ করতাম। বর্তমান পরিস্থিতি 'অনলাইন' আড্ডার দিকে তাকাতে চেয়েছে বেশি করে, কিন্তু তথ্য কোথায়! তথ্য বলতে আমি 'ভিজুয়াল ডকুমেন্ট'-এর কথা বলছি। খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে যে সত্যিই একেবারে সাম্প্রতিক বছরগুলো ছাড়া বিগত দিনের অধিকাংশ তথ্যই অবহেলায় বিস্মৃতপ্রায়।

এই যে ইতিহাস বিমুখিনতা, এর প্রতি দৃষ্টি দিতে শেখাল কোভিড-১৯। যার ফলশ্রুতিতে এবছর কতই-না চিত্রগ্রাহক,

তথ্যসংগ্রাহক, চিত্রনির্মাতার জোয়ার। তাঁরা মুহুর্মুহু ফোন করছেন, আর বিগতদিনের ছবির 'স্টক' চাইছেন। পুজোপরিক্রমার 'নির্ঘণ্ট' নির্মাণ করবেন আর 'ইউটিউব চ্যানেল'-এ ছাড়বেন। কী আনন্দ! অথচ যে-কাজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে, যে-কাজ দেখতে এসে প্রথমেই মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় হাত চলে যায়, সে-শিল্পের তথ্যই সঠিকভাবে গোছানো থাকে না। এসবই 'অথরশিপ'-এর ধারণার প্রতি ঔদাসীন্যের খেসারত। বর্তমান অতিমারি কিন্তু এটা চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেল।

ভালো, অবশ্যই ভালো—এভাবেই হয়তো সর্বজনীনতা আরও সামগ্রিক হবে। এত বছর ধরে ক্লাব এবং শিল্পীদের ঘরে যে মহামূল্য রত্নসম্ভার জমেছে তার মূল্য নির্ধারিত হবে আগামীতে। এটাই এই ধূসর সময়ের সেরা প্রাপ্তি বলেই আমার বিশ্বাস।

চিত্র-সৌজন্য লেখক

সনাতন দিন্দা

আমার জন্ম, বড়ো হওয়া সবই কলকাতার কুমোরটুলিতে। আমার মা বলতেন যে আমি নাকি ঠিকভাবে আঁক কষতে শেখার আগে থেকেই জল-মাটি নিয়ে চটকাতাম, পুতুল বানানোর চেষ্টা করতাম, পাশের খড়িমাটির দোকানের ধারে পড়ে থাকা খড়ি দিয়ে টলমলে পায়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে দাগ কাটতাম। আমাদের বাড়িওয়ালা ছিলেন ৺বাদলচন্দ্র পাল, ওঁকে আমি দাদু বলে ডাকতাম, উনি কৃষ্ণনগর ঘরানার ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরি করতেন, রং করতেন। আমি ছোটোবেলায় ওঁর পাশে

প্রতিমার কাজ চলছে

বসতাম, উনি বলতেন, "খোকা, একটু রং গুলে দে"। আমি রং গুলতাম। মাঝেসাঝে রং করতাম। বিশেষ করে বিশ্বকর্মা পুজো বা দুর্গাপুজোর সময় ওঁদের দোকানে বসে ঘট রং করতাম। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতাম কী করে ছাগলের লোম কাঠির ডগায় বেঁধে তুলি বানায় দাদু। এইভাবে ছোটো থেকে ওঁর কাজ দেখতে-দেখতে বিষয়টা আমার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল নিজের অজান্তেই। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে উনি আমার প্রথম গুরু— দ্রোণাচার্য।

এরকম করে পুতুল বানানো, কুমোরটুলির ঘট রং করা, বা কালীঘাটের পট আঁকা আমার শেখা হয়ে যায়। নিজে পুতুল বানাতাম আর ঝুড়ি করে নিয়ে গিয়ে এক শাগরেদের সঙ্গে

মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন লেখক

লুকিয়ে-লুকিয়ে কুমোরটুলিতে বেচতামও। যখন যে পুজো হত সেই মূর্তি বানিয়ে বাড়িতে পুজোও করতাম। কালী পুজোর সময় ডাকিনী-যোগিনীও বানাতাম। এছাড়া রাজবল্লভপাড়ায় 'বিপ্লবী' ক্লাব ছিল, ওখানে আমি ব্যান্ড বাজাতাম, আর সপ্তাহে একদিন রবিবার শ্রদ্ধেয় সমীর ভট্টাচার্যের কাছে ছবি-আঁকা শিখতাম। ওই ক্লাবের সরস্বতী পুজোয় প্রথম আমি বাড়ির বাইরে কারোর জন্য ঠাকুর গড়ি।

আমার বাবার কুমোরটুলিতে মুড়ির দোকান ছিল। অনেক ঠাকুর বানানোর কারিগর দোকানে আসতেন। তাঁরা বলতেন, "কাকা, তোমার ছেলে ভালো কাজ করে, ওকে আর্ট কলেজে

পুজোর আগে কর্মরত লেখক

ভর্তি করে দিয়ো”। এদিকে আমারও পড়াশোনায় ঠিক মন ছিল না। পড়ার বইয়ের মধ্যে গল্পের বই রেখে পড়তাম। সেভেন-এইটে থাকতেই আমার গোর্কির *আমার ছেলেবেলা*, *পৃথিবীর পথে*, *পৃথিবীর পাঠশালা* পড়া হয়ে যায়, মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প, জন রিডের *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, নিকোলাই অস্ত্রয়ভস্কি-র *ইস্পাত* পড়ে ফেলি। মাধ্যমিকের আগে মানিক-রবীন্দ্রনাথ-সতীনাথ—আরও কত লেখকের যে কত লেখা পড়া শেষ তার ইয়াত্তা নেই। ওইসব বই পড়ে আমার মেরুদণ্ড তৈরি হয়ে যায়, মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে শিখি। ফুটপাতে থেকেই জীবনকে চিনে ফেলি। ‘উই শ্যাল ওভারকাম’ শুনে ফেলি পিট সিগারের উদাত্ত কণ্ঠে। কিন্তু পড়ার বইয়ের প্রতি কোনো টান ছিল না আমার। ভূগোলে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না, অঙ্ক

কাশী বোস লেন (২০১৮)

আমায় দূরে সরিয়ে দেয়, বিজ্ঞান থেকে আমি অনেক দূরে। খালি মূর্তি গড়তে, রং করতে, ছবি আঁকতে ভালো লাগত। শেষমেশ ইস্কুল পাশ করে আমি ওই আর্ট কলেজেই ভর্তি হই। ইচ্ছা ছিল স্কাল্পচার নিয়ে পড়ব, কিন্তু পয়সার অভাবে ওয়েস্টার্ন পেন্টিং নিয়ে পড়ি।

১৯৯২-এ আর্ট কলেজ থেকে বেরনোর পর আমি ছবি আঁকতাম, এগজিবিশন হত, ছবি বিক্রিও হত—শিল্পী হিসেবে বেশ নামডাকও হয়। কিন্তু কীরকম যেন মানুষের থেকে নিজেকে দূরে মনে হত। বড়ো ইচ্ছে হত এমন কিছু করি যাতে মানুষের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে থাকতে পারব—মানুষকে একটু অন্য ধরনের শিল্পকর্ম দেখাব। দুর্গাপুজোর মধ্যে সে-সুযোগটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের আর্ট কলেজের সিনিয়ার

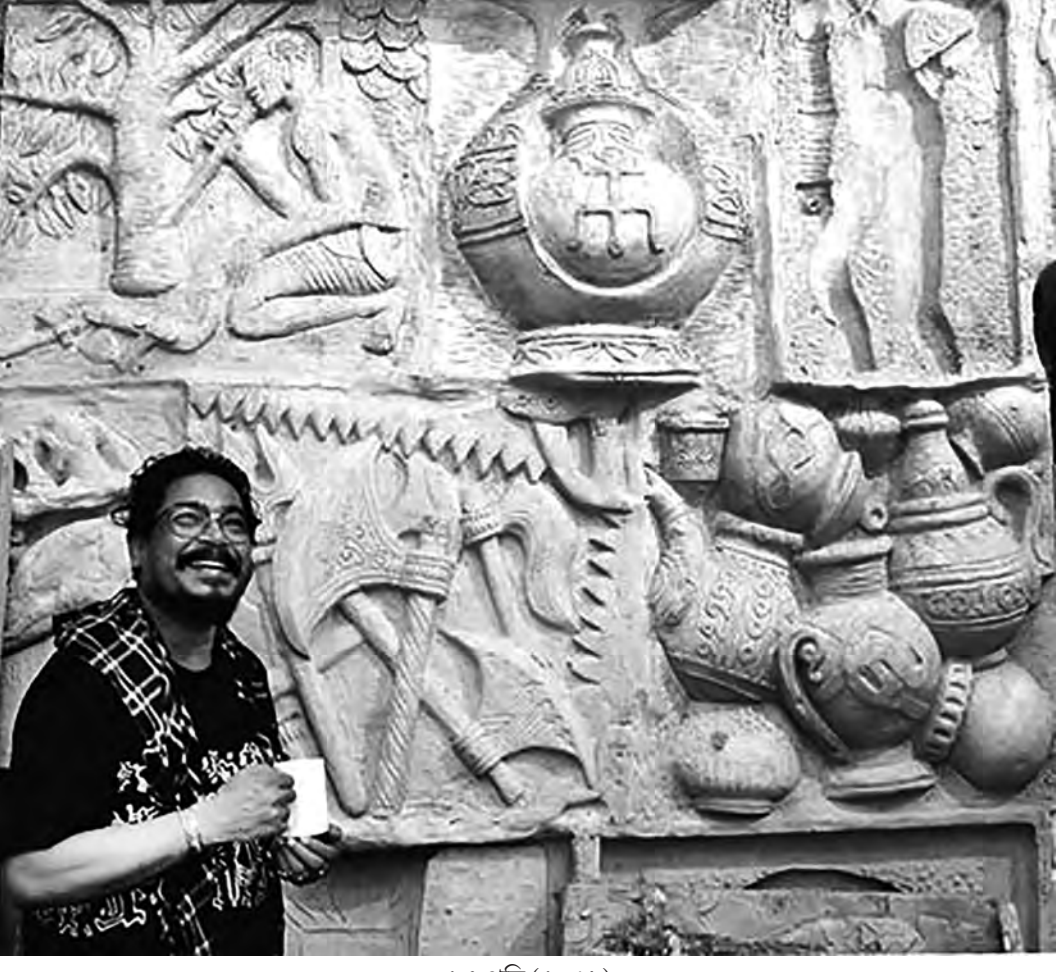

২৫ পল্লি (২০১৯)

সুখেন্দুদা হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো করতেন। ওই পাড়ায় আমি আড্ডা মারতাম। ১৯৯৮-এ ও-পাড়ার বন্ধুরা বলল, "দিন্দা, এবার পুজোটা তুই কর"। আমি প্রথম বছরেই প্রতিমার খোলনলচে বদলে ফেললাম। বানালাম গণেশজননী। একটা আটপৌরে শাড়ি পরে কাঠের ঘোড়াসিংহীর ওপরে দেবী বসে, দশহাতে কোনো অস্ত্র নেই। অস্ত্রের জায়গায় রয়েছে বরাভয় মুদ্রা। সেবছর গালফওয়ার চলছিল, চারদিকে বারুদের গন্ধ,

কাজ চলছে

পোড়া তেলের দূষিত বাতাস—তাই ছাপোষা ঠাকুর করে শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়াটাই ছিল উদ্দেশ্য। নামকরণ হয়েছিল: বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি। পুজো করে আমি সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগটা তৈরি করতে পেরেছিলাম। দেখলাম কত লোক ভালোবাসছে। কত লোক এসে কথা বলছে। আমি ভলেন্টিয়ার হয়ে পুজোর ক-দিন প্যান্ডেলে বসে থাকতাম। কার কেমন লেগেছে জানাতেন। মনটা ভরে যেত। মাইকে যখন আমার নামটা বলত খুব ভালো লাগত। মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে পুজোটা আমার কাছে একটা আর্টের ইন্টার‍্যাকটিভ প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল।

দুর্গাপুজো করে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, পুজোটা এমন এক প্লাটফর্ম যেখানে একটা

সমান্তরাল ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে শিল্পীদের জন্য। কারণ, ততদিনে আর্ট কলেজের সিনিয়ার দাদারা কলকাতায় পুজো করতে শুরু করেছেন। তরুণদা, অমরদা, দীপকদারা কাজ করতেন। আমি চাইছিলাম ভবিষ্যতের শিল্পীরা, যারা আর্ট কলেজে পড়ছে বা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে সবে বেরিয়েছে, তাদের একটা সাময়িক কাজের সুযোগ করে দিতে, যেখান থেকে কাজ শেখার পাশাপাশি তারা কিছু রোজগারও করতে পারবে। এটা আমার কাছে ভীষণ দরকারি মনে হয়েছিল। কারণ, পাশ করেই রোজগারের সংস্থান করতে পারাটা খুব শক্ত। বহু শিল্পীকে তাই অসীম দারিদ্র্যে দিন কাটাতে হয়। পুজোর মাঠে বা গলিতে কাজ শিখতে এলে তারা পয়সা পাবে। পরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এই কাজের অভিজ্ঞতা তাদের সাহায্য করবে।

হাতিবাগানে ক-বছর পুজো করার পর পুরস্কার না-পাওয়ার জন্য আমি কর্মকর্তাদের বিরাগভাজন হলাম। কিন্তু সুযোগ পেতে আমার সময় লাগেনি। চলে গেলাম কাছেই, রাস্তার উলটো দিকে নলিনী সরকার স্ট্রিটে। অনেক বছর কাজ করার ফলে ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠল। মাঝখানে দু-বছর পুজো করিনি। ২০১১-তে নলিনী সরকার স্ট্রিটে পুজো করতে-করতে চক্রবেড়িয়াতে আমি ঠাকুর গড়লাম, প্যান্ডেল করেছিল শিবশঙ্কর দাস। সে-বছরটা যেন আমার বছর ছিল—এদিকে নলিনী সরকার স্ট্রিট হিট, ওদিকে চক্রবেড়িয়াও। তারপর টানা চার বছর ৯৫ পল্লি, পরপর দু-বছর বড়িশা ক্লাব করলাম। পাশাপাশি চেতলা অগ্রণীর পুজোও করেছি। গত বছর অবধি কাজ করেছি

মণ্ডপের কাজ চলছে

খিদিরপুর ২৫ পল্লি, বেহালা নতুন দল-এর পুজোয় আর ঠাকুর গড়েছি দমদম পার্ক তরুণ দলের।

আমার কাছে পুজোটা একটা কমপ্লিট ব্যাপার—লাইট-প্যান্ডেল-প্রতিমা-মিউজিক নিয়ে। আমার পুজোয় একটা মডেল তৈরি হলেও আমি নিজে হাতে করি। লাইট নিজে করি। কারণ আমি যে-আলোটা চাই সেটা দেখতে পাই। নিজে শিল্পী তো, থ্রি-ডাইমেনশন বা সুরিয়েল বিষয়টা যে-আলো দিয়ে তৈরি করা যায় সেটা নিজে করলে একটু সুবিধা হয়। গতবার অবশ্য আশিস সাহাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম আলোকসজ্জার জন্য। আগে মিউজিক নিজে করতাম। ১৯৯৮-এ যখন হাতিবাগানে পুজো করলাম, সেখানে মিউজিক নিজেই দিয়েছিলাম। বিভিন্ন ক্যাসেট থেকে নিয়ে বানাতাম। ২০০৩-এ প্রথম পেশাদার শিল্পী দিয়ে মিউজিক বানাই। পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু—টনিদা সেবার থিম মিউজিক বানান। এরপর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত তন্ময় বোসের সঙ্গেও কাজ

করেছি। ওঁরা মণ্ডপে এসেছেন, ঘুরে দেখেছেন, আমি কী ভাবছি জানতে চেয়েছেন—তারপর মিউজিক দিয়েছেন। ওঁদের এই ইনভলভমেন্টটা সত্যিই দারুণ!

পুজো করার সময় সব বিভাগেই গভীরভাবে জড়িয়ে থাকার জন্যই আমি চেষ্টা করি যাতে পুজো যেখানে করি তার কাছাকাছি কোনো জায়গায় থাকতে। গতবছর খিদিরপুর ২৫ পল্লিতে পুজোর সময় আমি ওখানেই একটা ফ্ল্যাটে ছিলাম। বেহালায় নতুন দলের পুজোর জন্য অভিষেক (ভট্টাচার্য)-এর ফ্ল্যাটে থাকি।

এবার অবশ্য অবস্থাটা অন্যবারের থেকে আলাদা। মার্চে অতিমারি ছড়িয়ে পড়ার পর পুজো নিয়ে একটা দোলাচল ছিল। অনেকে ঘটে পুজোর কথা বলছিলেন। আমি বলেছি ঘটে নয়, এবার পুজো পটে। পুজো হওয়াটা এই পরিস্থিতিতে খুবই দরকার। কারণ পুজোর দিকে হাজার-হাজার পরিবার তাকিয়ে থাকে। রুজি-রোজগার তাদের সব ওই পুজোকেই ঘিরে। গত বছরের 'ইকনমিক টাইমস'-এর একটা সার্ভেতে দেখা গিয়েছিল আমাদের রাজ্যে পুজোর তিনমাসে দেড় লক্ষ কোটি টাকা সারকুলেটেড হয়েছে। পুজো ছাড়া কে আর এ কাজ করে? পুজোপাগল কিছু মানুষ আর শিল্পীরা মিলে একটা অসংগঠিত ক্ষেত্র এই পুজোকে ঘিরে গড়ে তুলেছে, যেটা এবছর বন্ধ হলে বহু লোক না-খেতে পেয়ে মরবে। আমাকে নয়, কালীঘাটের পটুয়া কিংবা কুমোরটুলির শিল্পীদের কাজ দিন—সারা বছর ওঁরা এই পুজোর কাজের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের ভাবা উচিত, গড়িয়াহাট মোড়ের হকারদের কথা, পুজোর সময় যাঁরা বেলুন বেচেন বা রোলের দোকান দেন তাঁদের কথা। পুজোয় সামান্য রোজগার

হলে ওঁদের বাড়ির বাচ্চাটার গায়ে নতুন জামা উঠবে—সারা বছর ওরা সেই জামা পরবে। আবার অনেকে বলছেন প্রতিমা ছোটো করার কথা—কিন্তু কেউ কি ভেবেছেন সেই কারিগরের কথা যিনি আগে থেকে বড়ো ঠাকুরের বায়না নিয়ে সব করে রেখেছেন? তাঁদের কী হবে? আমার মতে, ঠাকুর ছোটো হলে দেখতে-আসা মানুষদের গা ঘেঁষাঘেষি হবে বেশি। বরং নিয়ম মেনে এগারো ফুটের মধ্যে ঠাকুর হোক, সামনে জায়াগা বেশি থাক, তা-তে বরং দূরত্ব রেখে মানুষ দেখতে পারবে।

আমি এবারও বেহালা নতুন দলের পুজোটা করছি। আমি ওটা আমার নিজের পুজো বলে ভাবি। ওরা কোনো পুজো ছাড়াই 'বেহুলা' নামের আর্ট-ফেস্ট করার জন্য আমাকে জায়াগা দিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ। দেবাশিস জানা আমাকে এবার সহযোগিতা করছে। ও মণ্ডপ বানাবে। আমি দশ ফুটের ঠাকুর করব আর নীচে পেডাস্টাল দিয়ে প্রতিমাকে আরও উঁচু করে দেব। পনেরো ফুট হাইটের প্যান্ডেলের সামনে বেশ দূর থেকে মানুষ প্রতিমা দেখবে—আশা করি দূরত্ব বজায় রাখা যাবে।

হ্যাঁ, এবারও থিম হচ্ছে। এই ক্রাইসিসের মধ্যেই তো নতুন করে থিম জন্ম নেয়, চিন্তার উন্মেষ হয়। আসুন পুজোর সময়ই না-হয় সে-থিম দেখা যাবে!

চিত্র-সৌজন্য: পার্থ দাশগুপ্ত

লেখক বিশিষ্ট শিল্পী, তিনি কলকাতার থিমের পুজোর অন্যতম রূপকার।
sanatandinda@gmail.com

সুশান্ত পাল

ছোটোবেলা থেকেই আমার পুজোর ওপর একটা আলাদা টান ছিল। কসবায় তখনকার বাড়ির সামনের মাঠটায় পুজোর ক-সপ্তাহ আগে বাঁশ পড়ার আওয়াজে কোনো একদিন সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে যেত। তারপর রোজ জানলা দিয়ে দেখতাম কী করে একটা ফাঁকা জায়গা ধীরে-ধীরে অন্য একটা স্ট্রাকচারে বদলে যাচ্ছে। আবার চতুর্থীর দিন শাঁখ-উলুর আওয়াজে পুজোর মাঠে দৌড়ে যেতাম দেখতে পাড়ার ঠাকুরটা ঠিক কত বড়ো হয়েছে। এছাড়া কুমোরটুলির জিতেন্দ্রনাথ পাল এন্ড সন্স, মানে যাঁরা

প্রতিমানির্মাণে ব্যস্ত লেখক

বাগবাজারে ঠাকুর বানান, তাঁরা আমাদের আত্মীয়, তাই তাঁদের বাড়িতেও নানা কারণে আমাদের যাতায়াত লেগে থাকত। ওই সময়ে কুমোরটুলিতে ঠাকুর বানানো দেখতাম। এসব বিষয়গুলো আমার অবচেতনে দুর্গাপুজো, ঠাকুর-বানানো বা পুজো করার সুপ্ত ইচ্ছাটা তৈরি করেছিল।

পাশাপাশি পাড়ায়-পাড়ায় আশির দশক থেকেই দুর্গাপুজোয় একটা বদল শুরু হয়েছিল। ১৯৮৫-তে 'এশিয়ান পেন্টস শারদ সম্মান' চালু হয়েছে। পুজোর কর্মকর্তারা পাড়ার ডেকরেটারকে ছেড়ে নামি কোনো ডেকরেটারকে দিয়ে প্যান্ডেল বানাতে চাইছেন। এমনকি মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চল থেকে যে-মণ্ডপশিল্পীরা আসতেন তাঁরা মণ্ডপসজ্জায় নিজেদের এলাকার শিল্প-শৈলীকে ব্যবহার করছেন। এভাবেই আস্তে-আস্তে মূল

বেহালা সহযাত্রী (২০০৩)

ঘরানাটা বদলাতে-বদলাতে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আর্ট কলেজের ছাত্ররা নিজের পাড়ায় পুজোর কাজটা শুরু করল। যেমন হাতিবাগান সর্বজনীনে আমাদের আর্ট কলেজের সিনিয়ার দাদা সুখেন্দুদা পুজো করলেন। সেবছর ওই পুজোটা শারদ সম্মান পেল।

আমি তখন আর্ট কলেজের ছাত্র। ৯৬-৯৭ দু-বছর এশিয়ান পেন্টস শারদ সম্মানের মতো আরেকটি কর্পোরেট গ্রুপ অ্যালপিক শারদ সম্মান শুরু করেছিল। বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষকে তাঁরা যেমন বিচারক হিসাবে রেখেছিলেন, নিয়েছিলেন আমাদের মতো আর্ট কলেজের বেশ কিছু পড়ুয়াকেও। দু-বছর আমি আমার বন্ধুদের মতো বেশ কিছু মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছিলাম। সেসময় মনে হয়েছিল দুর্গাপুজো নিয়ে কিছু একটা অন্যরকম ভাবা যায়। সেই আশায় আমার আর্ট

সন্তোষপুর লেকপল্লি (২০১০)

কলেজের সহপাঠী নব, জিতেন্দ্রনাথ পাল এন্ড সন্স-এর বাড়ির নাতি নবকুমার পালকে বললাম, ওদের ওখানে তো অনেক ক্লাবই ঠাকুর বানাতে যায়, তাদের কেউ যদি আমায় এই কাজটা করার সুযোগ দেয়। নব স্কাল্পচার নিয়ে আমার সঙ্গেই পড়ত, যদিও আমার বিভাগ ছিল টেক্সটাইল।

সুযোগও চলে এল। নব আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বেহালা সহযাত্রী ক্লাবের কর্মকর্তাদের। এখন অবশ্য সহযাত্রী আর সৃষ্টি মিলে বড়িশার পুজো করে। ওই ক্লাবের মানুষজনের সঙ্গে পুজোর বিষয়ে আমার কথা হয়। মজার ব্যাপার হল, ১৯৯৭-এ প্রাথমিক বিচারক হিসেবে আমি ওঁদের মণ্ডপটিতেও গিয়েছিলাম। ওঁরা সেটা মনে করতে পারেন এবং

বেহালা ফ্রেন্ডস (২০১৫)

আমায় জিজ্ঞাসাও করেন কেন সেই সতীপীঠ নিয়ে করা ওঁদের পুজোটি প্রাথমিক নির্বাচন থেকে বাদ পড়েছিল। আমি ওঁদের বুঝিয়ে বিষয়টি বলি, পুজো মানে শুধু মূর্তি বা প্যাণ্ডেল বা লাইট নয়—সবগুলো মিলেমিশে একটা বিষয় উঠে আসবে। আমার কথা ওঁদের ভালো লাগে। সে-বছর আমার দায়িত্ব ছিল নব যে-মূর্তিটি গড়বে তার ডিজাইন করার। থিমের ভার ছিল আমাদের কলেজেরই সিনিয়ার দেবেন লাহা-শ্রুতি লাহার ওপর। ওঁদেরও সাহায্য করার একটা দায়িত্বও ছিল আমার। ওই বছর বেহালার সহযাত্রী শারদ সম্মান পায়। আর প্রাথমিক সাফল্য পুজোর কাজে আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেয়।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৯-এ আমি ওই ক্লাবের দুর্গাপুজোর একক দায়িত্ব পাই। কিন্তু ২০০০ ও ২০০১-এ আবার আর্ট

৯৫ পল্লি (২০১৬)

কলেজে নতুন চালু মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার কারণে কোনো পুজোর কাজ করিনি। ২০০২-এ বেহালার সহযাত্রীতেই পুজোর কাজ শুরু করলাম। ততদিনে অবশ্য কলকাতা জুড়ে শিল্পীরা কাজ শুরু করে দিয়েছে দুর্গাপুজোর। অমরদা কাজ করছেন। ভব (ভবতোষ সুতার) ওঁকে অ্যাসিস্ট করছে। সনাতন দা (সনাতন দিন্দা) পুজো করছেন। পার্থদা (পার্থ দাশগুপ্ত) পুজো শুরু করেছেন ২০০২-এ। বোঝা যাচ্ছিল যে পুজো সেই পুরোনো ঘরানা থেকে অনেকটা সরে আসছে। শুরু হয়ে গেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গোটা কলকাতা জুড়েই প্রায় খুলে গেছে দুর্গাপুজোয় শৈল্পিক অভিব্যক্তির নতুন দিগন্ত।

২০০২-এ সহযাত্রী-তে আমি টেক্সটাইল মিডিয়ামের ছাপাই ব্লক নিয়ে একটা থিমে পুজোর কাজ করলাম। সেবার সাফল্যের

টালা পার্ক প্রত্যয় (২০১৯)

মাত্রা এত বেশি ছিল যে তারপর থেকে আমি পুজো করে গেছি, পুজোর কাজ পাওয়া নিয়ে আমাকে আলাদা করে কোনোদিন ভাবতে হয়নি। প্রত্যেক বছর আমি আমার আগের কাজকে বলতে গেলে প্রায় চ্যালেঞ্জ করে নতুন ধরনের কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছি।

অবশ্য এর মধ্যে ঘটে গেছে বেশ কিছু যোগাযোগ। যেমন আমি এই শতকের গোড়াতেই কলকাতার পোশাক-সংস্কৃতির বিবর্তনের অন্যতম অংশভাক বুটিকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আমার নিজের বিষয় যেহেতু টেক্সটাইল ডিজাইন তাই এ ব্যাপারে আমার আলাদা আগ্রহ ছিল। তখন অবশ্য এত বুটিক ছিল না। আমি 'স্টেপ' নামের একটা বুটিক শুরু করি। সেখানে নানান পোশাকের ডিজাইনের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে লাগলাম।

এই পোশাকের সূত্র ধরেই আলাপ হল চলচ্চিত্র নির্দেশক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে। তখন তিনি 'বাড়িওয়ালি' ছবিটি নিয়ে কাজ করছিলেন। ওই সিনেমায় কিছু ট্রাডিশানাল কাঁথার ডিজাইন দরকার হয়েছিল। আমাকে সে-কথা বলতে, আমি ওঁকে কিছু নমুনা দেখাই। ওঁর খুব পছন্দ হয় আর আমি তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে কাজ করতে থাকি। 'দহন', 'তিতলি' প্রভৃতি ছবিতে আমি পোশাকের ডিজাইন করি। ২০০৩-এ 'চোখের বালি' ছবির সময় সম্পূর্ণভাবে ঋতুদার সঙ্গে আমি কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে যোগ দিই। ঋতুদার ইউনিটের অন্দরমহলের সদস্য হওয়ার পর যোগাযোগ নিবিড় হল অনেকের সঙ্গে—সিনেমাটোগ্রাফার অভীকদা (অভীক মুখোপাধ্যায়), এডিটর অর্ঘ্যদা (অর্ঘ্যকমল মিত্র), মিউজিক ডিরেক্টর দেবজ্যোতিদা (দেবজ্যোতি মিশ্র)। এঁদের কাছ থেকে নানা সময়ে নানান ইনপুট পেয়েছি। সবাই জানতেন যে আমি দুর্গাপুজো করি। ২০০৩-এ আমি এঁদের সবার সান্নিধ্য পেয়ে পুজোয় সিনেমার মিশেল ঘটাই। সেবারের বিষয় ছিল 'রুপোলি পর্দায় সোনালি প্রতিমা'। ঋতুদা ও ইউনিটের অন্যান্যরা আমায় খুব উৎসাহ দেন।

মোট ষোলোটা সিনেমা আমি প্রথমে নির্বাচন করি। তারপর বেছে নিই সেই সিনেমাগুলোর সিগনেচার শট—যে-ছবিটা দেখলেই সবাই একবারেই বুঝতে পারবে কোন ছবির কথা বলা হচ্ছে। যেমন, 'পথের পাঁচালী'-র অপু-দুর্গার কাশবনের ছবিটা। 'অনুসন্ধান'-এও দুর্গাপুজোর একটা দৃশ্য ছিল। আবার 'অমর প্রেম' তৈরি হয়েছিল গণেশজননীর ভাবনাকে কেন্দ্র করে। কিংবা 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এর দুর্গামূর্তির সিংহের মুখের ভিতর

টালা পার্ক প্রত্যয় (২০১৯)

গণেশের মূর্তিটা লুকিয়ে রাখা, চক্ষুদানের দৃশ্য। আবার 'উৎসব' ছবির নানা মুহূর্ত, যা একবারে দুর্গাপুজোকে মনে করিয়ে দেবে। এইসব সিনেমাগুলিকে বাছা ও সেগুলির প্রেক্ষাপটে পুজোর ভাবনাকে নিয়ে আসাটাই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। মণ্ডপটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেন তার ঢোকার পথটা দেখে মনে হবে বর্তমান মাল্টিপ্লেক্সের প্রবেশপথ—সেখানে টাঙানো ছিল ওই চলচ্চিত্রগুলোর রি-ডিজাইনড পোস্টার। ঠিক যেমন এখন থাকে—যে-সিনেমাটা দেখানো হচ্ছে তার বা যে-সিনেমাগুলি আসতে চলেছে সেগুলোর বিজ্ঞাপন। মণ্ডপের

ভিতরটা ছিল আসল সিনেমার স্টুডিয়ো ফ্লোরের মতো—উঁচু সিলিং, ক্যাটওয়াক, সাউন্ডপ্রুফ দেওয়াল। সিনেমায় যেমন একটা দৃশ্যের জন্য দরকারি জিনিসটাই শুধ সেটে বানানো হয়, ওখানেও তাই হয়েছিল। একটা ঠাকুরদালান, সেখানে দুর্গাপুজো হচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঠাকুরদালান বানানো হয়নি, ঠিক শুটিংয়ের জন্য যেমন দরকার, ততটুকুই। কাগজ দিয়ে তৈরি সাদাকালো চেকার্স মেঝে, দরজা, কাটা স্ট্যান্ডে লাগানো জানলা, চাঁদোয়া—এইরকম। কখনওই দেখে সেটাকে কমপ্লিট কিছু মনে হবে না। ওখানে একটা প্রোজেকশানের ব্যাপারও ছিল। যে সময় পুজো হত সেসময় শুট করা হত। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে একটা ইনকমপ্লিট ঠাকুরদালানে পুজো হচ্ছে, কিন্তু প্রোজেকশানে দেখলে তা মনে হত না। সিনেমার সেট আর বাস্তবটাকে সমান্তরালভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। পাশাপাশি, যখন পুজো হত না, অর্থাৎ লাইভ প্রজেকশান চলত না, সেই সময়ের জন্য একটা অল্প সময়ের শো তৈরি করা হয়েছিল ওই ষোলোটা ছবিকে কেন্দ্র করে। তার স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়েছিল, এডিট করে দিয়েছিলেন অর্ঘ্যদা, মিউজিক দিয়েছিলেন দেবজ্যোতিদা। সব মিলিয়ে একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল। আর মানুষের মনেও ধরেছিল খুব পুরো বিষয়টা।

এরপর ঋতুদার সঙ্গে আমি কাজ করতে থাকি কস্টিউম এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হিসেবে। 'চোখের বালি' সিনেমায় কস্টিউম ডিজাইনের জন্য আমি পুরস্কারও পাই। আর ওই ইউনিটের সদস্য হওয়ায় এবং ঋতুদার সান্নিধ্যে আমি নানাভাবে সমৃদ্ধ হই। পাশাপাশি প্রতি বছর পুজোও করতাম। তবে বুটিকটা

কাজের চাপে বন্ধ করে দিই। আসলে প্রতি বছরের কাজটা একটা চ্যালেঞ্জ, আর এই চ্যালেঞ্জটা হল নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার। কারণ, মনে রাখতে হবে, পুজোর আয়োজকরা প্রত্যেক বছর আমার হাতে পরের বছরের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন প্রায় এক বছর আগে—আমি কী করব সে-বিষয়ে কিছু না-জেনেই। আমাকে মক-আপ করতে হচ্ছে না। তাঁদের বোঝাতে হচ্ছে না কাজটা পাওয়ার জন্য। সিনেমা বানাতে গেলেও কিন্তু স্ক্রিপ্ট পড়তে হয়, প্রযোজককে বোঝাতে হয় বিষয়টা, কাস্টিং কী হবে বা বাজেট—সে নিয়েও বিস্তর আলোচনার পর সব ঠিক হয়।

দুর্গা আমার কাছে তো একটা কনসেপ্ট, তাঁর মূর্তি কেউ কোনো-না-কোনো দিন কল্পনা করে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পুরাণে তাঁর যে কাহিনি আছে, সেটারও একটা আদল মাথায় রেখে অশুভ শত্রুর হাত থেকে ত্রাণ করেন যে-দেবী তাঁর একটা কল্পনা ও ভাবনা আমাকে পুজোর মাঠে তুলে ধরতে হয়, অবশ্যই আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই অশুভ শক্তির বিনাশকারী দেবী কিন্তু সমাজের সব স্তরেই বিরাজমান, তাঁকে খুঁজে এনে সেই ভাবনাটাকে সময়োপযোগী করে আমায় তুলে ধরার চেষ্টা করি।

এই পুজোশিল্প ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের শিল্পের মেলবন্ধন, যেমন মণ্ডপ-আলো-মূর্তি-মিউজিক। সিনেমায় যেমন একজন নির্দেশক একটা ভাবনা ভেবে নানা বিভাগে কুশলী লোকজনকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে গোটা ফিল্মটা বানান, ঠিক তেমনই পুজোর ক্ষেত্রে আমাদেরও ভাবনাটা উপস্থাপনা করতে নানা বিভাগের দক্ষ মানুষদের সেই চিন্তাটা রূপায়ণে করণীয় বিষয়টা বোঝাতে হয় ও ফাঁকা মাঠে সেই কনসেপ্টটা তিলে-তিলে গড়ে ওঠে।

গতবছর তিনটে পুজো করেছিলাম—টালাপার্ক প্রত্যয়, ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়া, এভিনিউ সাউথ। এবছরও তিনটে পুজোর চুক্তি হয়ে গিয়েছিল গত পুজোর শেষে। সে-পুজোগুলোকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ এই পুজোর মাঠই এখন আমার একমাত্র শিল্প-অভ্যাসের জায়গা, পুজো হল আমার শিল্প-প্রদর্শনী, আর পুজো দেখতে আসেন যাঁরা তাঁরা আমার প্রদর্শনীর দর্শক। সারা বছর ধরে আমি তাই ওই পুজো নিয়ে নানা রকম চিন্তা করি, স্ক্রিবল করি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মার্চ মাসে যখন এই অতিমারির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল তখন গোটা পরিকল্পনায়ও সে প্রভাব পড়ল।

ঠিক হল, এবারেও পুজো হবে, কিন্তু সে-পুজো হবে মানবিক পুজো। ক্ষেত্র অনেক ছোটো হবে, অনেক কম লোক কাজ করবে, পুজোকেন্দ্রিক অর্থনীতিও ধাক্কা খাবে—তবুও আমাদের লক্ষ্য থাকবে মানুষকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে অন্য ধরনের পুজো-পরিবেশ তৈরি করা এবং মানুষর পাশে থেকে অন্য ধরনের শারদ অঞ্জলির ভাবনা ফুটিয়ে তোলা। যেমন ৯৫ পল্লি যোধপুর পার্কে এবছর খুঁটিপুজোর আড়ম্বেরর বদলে আমরা কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ শিল্পীসম্প্রদায়ের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গিকারে বদ্ধ হই। এভাবেই আমাদের দুর্গাপুজোয় আমরা মানসিকভাবে জড়িয়ে ফেলেছি দূরের ওই শহরটাকেও, মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণনগরেও আমাদের পুজো হচ্ছে।

বিবেকানন্দ পার্কের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সূচনা হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। ওদের কথায়, সূচনা কুড়িতে, উৎসব একুশে। সূচনায় ওঁরা হাওড়ার কোভিড ১৯ রোগীদের জন্য একটা এমবুলেন্স

দিচ্ছেন। ওই পুজোর ভাবনা নিয়ে এমবুলেন্সটি কলকাতা শহর ছাড়িয়ে বরাভয় বার্তা পৌঁছে দেবে পাশের শহর হাওড়াতে। আবার টালা পার্ক প্রত্যয়ের পুজোয় এবার অভিনব চক্ষুদান হল মহালয়ার দিনই—দেবীর চোখ আঁকা হল কোনো মৃন্ময় মূর্তিতে নয়, একটা ভ্রাম্যমাণ স্যানিটাইজিং যানে, যেটা গোটা কলকাতা ঘুরে বেড়াবে মানুষকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে।

আমরা সকলেই উনিশের পরে এই যে কুড়ি সাল দেখছি, কাগজ-কলমে লিখছি—সেটা কিন্তু কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। তাই ব্যতিক্রমী সময়ে কলকাতার পরিণত শিল্পীরা সমাজের কথা স্মরণ করে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে যে অন্য এক বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে তা সব শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই আশা করেন। আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তাঁদের ইচ্ছাপূরণের। আশা করি, আগামী বছর একুশে পৃথিবী আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসবে এবং কলকাতার দুর্গাপুজো তার পুরোনো রূপ ফিরে পাবে—এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

চিত্র-সৌজন্য: লেখক

লেখক বিশিষ্ট শিল্পী, তিনি কলকাতার থিমের পুজোর অন্যতম রূপকার।
2susanta@gmail.com

ভবতোষ সুতার

আমি কলকাতায় দুর্গাপুজোর কাজ শুরু করি ২০০০-এ। সে-বছরই আমি সরকারি আর্ট কলেজ থেকে সবে পাশ করে বেরিয়েছি। তবে দুর্গাপুজোর কাজ করব—এ চিন্তা আমার কখনও ছিল না। তখন ভাবতাম, বাইরে পেপার পাঠাব, বিদেশে পড়তে যাব। ওয়েস্টার্ন পেন্টিং নিয়ে তখন বেশ ভালোভাবে পাশ করে বেরিয়েছি, একেবারে অন্য চিন্তাভাবনা ছিল। তাছাড়া তরুণদা (দে)-র সংস্থা এনভায়রনমেন্টাল আর্টের সঙ্গে অনেকদিন ধরে যুক্ত ছিলাম—তাই আর্ট নিয়ে ভাবনাটা ছিল অন্যরকম। বড়িশার

৯৫ পল্লী যোধপুর পার্ক (২০১৮)

জনকল্যাণ ক্লাব থেকে যখন পুজোর কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন প্রথমে আমি রাজি হইনি। পরে যখন প্রস্তাবটা গ্রহণ করি তখন সেই ছোটো বাজেটের পুজোটা করতে গিয়ে আমার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়। পুজোর সময় দেখি আমার বানানো ঠাকুর দেখতে মানুষের লম্বা লাইন। এত লোকে আমার বানানো শিল্পকর্ম দেখতে আসছে—তা দেখে আমার চিন্তাটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। মনে হয়, দুর্গাপুজোয় অনেকে কিছু করার আছে। এত বড়ো একটা প্লাটফর্ম যেখানে শিল্পটা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে আছে। এখানে শিল্প ও জীবন, জীবনের মধ্যে শিল্প, জীবিকা—সব কিছু মিলেমিশে একাকার। এগুলো কোথাও শেখানো হয় না। সব কিছু দেখে মনে হল এটাই আমার শিল্প-অভিব্যক্তির ঠিকঠাক জায়গা। তাছাড়া শিল্পীরও টিকে থাকতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, সেজন্য পেশাদার শিল্পী হিসেবে আমি দুর্গাপুজোকে আমার

নাকতলা উদয়ন সংঘ (২০১২)

কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিই। এবং পরবর্তী কুড়ি বছর এই কাজ করে চলেছি।

এখন দুর্গাপুজো আমার কাছে শুধু আর্ট নয়, বা কেবল অর্থ উপার্জনের জায়াগা নয়—একটা বহুস্তরীয় বিষয়। যেখানে প্রতিমা আছে, মণ্ডপ আছে, আলো রয়েছে, মিউজিক আছে, সাউন্ডও চলে এসেছে। এতগুলো মাধ্যমকে এক জায়গায় করে মূল পুজোয় রূপ দিতে হয়। দুর্গাপুজোর মাঠ এমন একটা জায়গা যেখানে না-কাজ করলে এখন মনে হয় আমার শিল্পী হয়ে ওঠা হত না। প্রথম বছর পুজো করার পর দ্বিতীয় বছর আমি একটা প্রতিমা বানিয়েছিলাম বেহলার সৃষ্টি-র জন্য, যেটা দেখতে মানুষ দ্বিতীয়া-তৃতীয়া থেকে লাইন দিয়েছিল। মানুষের এই ভালোবাসা দেখে সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম দুর্গাপুজোর

পুজোর কাজে ব্যস্ত লেখক

কাজের ক্ষেত্র আমার শিল্পভাবনাকে মেনে নিয়েছে। তারপর থেকে পুজোর কাজের ব্যাপারে আমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপরে কলকাতার পুজোর সঙ্গে বিশ বছর যুক্ত থাকায় দেখেছি অনেক। শরিক হয়েছি পুজোর বিবর্তনের ইতিহাসের। প্রথম-প্রথম পুজোয় দেখতাম একটা ডেকরেশন-নির্ভর ব্যাপার রয়েছে। তারপর সে-জায়গাটা নিল বাংলার ফোক আর্ট—বাংলার বহমান বা হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প—সেগুলোকে তুলে আনা পুজোর থিমের মধ্যে। আস্তে-আস্তে সে-ধারাটা পালটে তৈরি হল এক নতুন ধারা—সেটা সম্পূর্ণ কনসেপ্ট নির্ভর। শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবনা, সামাজিক বিষয় এই কনসেপ্ট-নির্ভর পুজোয় শিল্পরূপের মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে

শুরু করল। আনন্দের কথা, মানুষ সেটাকে কিন্তু গ্রহণ করেছে। এখন দর্শকরা এই শিল্পের ভাষাটা বোঝার চেষ্টা করছেন। ধরা যাক একটা ইন্‌স্টলেশান বা বিশেষ ফর্ম—মানুষ সেটার মধ্যে দিয়ে পাঠানো বার্তাকে পড়তে প্রচেষ্টা করছেন। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক। আগের ডেকরেশন-নির্ভর পুজোয় তাঁরা শুধু নান্দনিক সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পেতেন, এখন তাঁরা শিল্পের ভাষাকে বুঝতে চাইছেন এবং রসাস্বাদন করছেন। তাই আমার মনে হয়, ইয়োরোপে যেমন 'হোয়াইট কিউব'-এর বাইরে শিল্পকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে নানা মাধ্যমের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, এদেশেও সেটা দুর্গাপুজোতে বোধহয় করা সম্ভব হচ্ছে। আর সেটার বাস্তবায়ন হয়েছে দুর্গাপুজো স্পনসরড বলে, করপোরেট যোগ থাকার কারণে, এবং সর্বোপরি মানুষের এই পুজোর সঙ্গে একটা নাড়ির সম্পর্ক থাকার সূত্রে। তাই এই শারদীয়া পুজো ধীরে-ধীরে একটা ইন্ডাস্ট্রির মতো হয়ে উঠেছে—বহু লোকের রুজিরুটির উৎস হয়েও উঠেছে।

সব থেকে বড়ো কথা এই বিবর্তনের ফলে যে-ক্ষেত্রটা প্রস্তুত হয়েছে সেখানে একজন শিল্পী একক ও স্বাধীনভাবে তাঁর চিন্তাকে অতটা বড়ো মাপে তুলে ধরতে পারছেন। তার জন্য তাঁকে কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। পুজোর সময় বিপুল দর্শক এসে তা দেখে যাচ্ছেন। এত স্বাধীনতা ও সুযোগ কোনো গ্যালারিও বোধহয় দিতে পারবে না। যেমন গত বছর আমি একটা পুজো করেছি নাকতলা উদয়ন সংঘে, যেখানে ব্যবহার করেছি বাঁশ-খড় এবং দশহাজার মাটির কলসি। সেটার

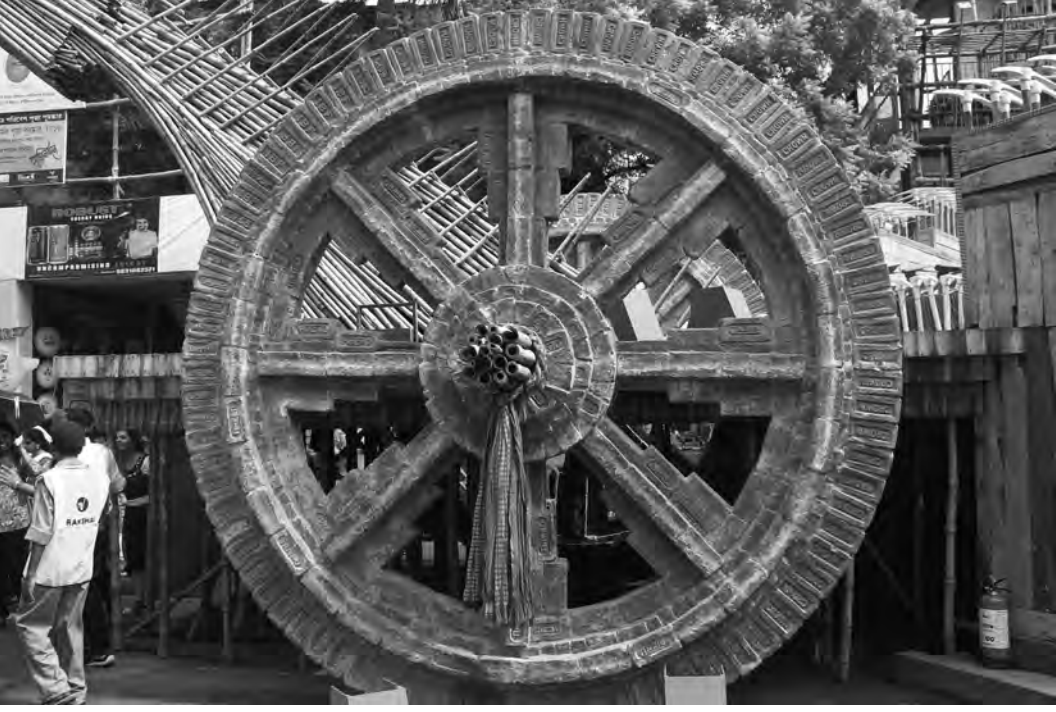

মণ্ডপের কাজ

একটা কাইনেটিকস ছিল, গোটাটা একটা বাদ্যযন্ত্রের মতো বানিয়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটাই একটা বড়ো বাজেটের ব্যাপার। সেই বাজেটটা দুর্গাপুজো ছাড়া আর অন্য কোনো ক্ষেত্রে আশাই করা যায় না। এছাড়া পুজোর সময় সাধারণ মানুষ আসছেন, শিল্পকে দেখছেন, উপভোগ করেছেন—সেই সঙ্গে শিল্পের সামাজিকীকরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যাচ্ছে।

কুড়ি বছর এই কাজ করতে গিয়ে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। নানা বিষয় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি। তবু আমার এখনও ঠাকুর বানাতেই সব থেকে ভালো লাগে। ওটাই আমার প্রথম পছন্দের জায়গা। কেউ যদি আমায় বলে তোমায় ঠাকুর বানাতে হবে না, তবে আমি আর পুজো করব না। যদিও শুধু প্রতিমা নয়, সব কিছুই জড়িয়ে আছে পুজোয়, তবু আমার এটা মনে হয়। আলোও

এখানে একটা শক্ত বিষয়। আলো দিয়েই পুরো বিষয়টাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। কিন্তু ঠিকঠাক আলোর শিল্পী এখনও কলকাতাতে পাই না। যাঁর বেশি আলো আছে তাঁকেই আমরা ভালো মনে করি। তবে নানা সমস্যা থাকলেও কাজটা এতদিন চালিয়ে গেছি। মাঝে-মাঝে ক্লান্ত লাগে। কোনো একবছর পুজোর কাজ না-করে ঘুরে-ঘুরে কলকাতার পুজোটাকে উপভোগ করতে ইচ্ছে করে, ডকুমেন্টেড করে রাখতে বাসনা হয়। কাজের চাপে সে-অবসর আমি আজ পর্যন্ত কিন্তু পাইনি।

হঠাৎ করে অবসরের সুযোগ এসে গিয়েছিল মার্চ মাসে যখন করোনার প্রভাবে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। তার আগে অবধি মানসিকভাবে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কারণ অনেকেই সম্ভবত জানেন আমি কলকাতার দুটো বড়ো পুজো করি। তাদের চাহিদা অন্যরকম। সেই ইচ্ছেটাকে রূপ দিতে বিরাট পরিকল্পনা ছিল পুজো নিয়ে। সে-পুজোয় বিদেশ থেকেও শিল্পীদের আসার কথা ছিল। অনেক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করার কথা ছিল। সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং কাজের মকশোও করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই স্তব্ধতা অবসর অনিশ্চিয়তা আমাকে অন্যভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করল।

এতদিন ধরে আমি ও আমার স্ত্রী যে বিরাট লাইব্রেরিটা তিলে-তিলে গড়ে তুলেছিলাম সেটার অনেক বই-ই না-পড়া ছিল। তাই লকডাউনের শুরুর আড়াই মাস আমি বই পড়তে শুরু করলাম—দিনে প্রায় আট-ন ঘণ্টা করে পড়তাম। আমি যে জায়গাটায় থাকি সেখানকার পরিবেশের নীরবতা, সবুজ গাছপালা, পাখপাখালি আমাকে সজীবভাবে ওই পড়াশোনার

পুজোর কাজে ব্যস্ত লেখক

কাজ করতে সাহায্য করে। মানসিকভাবে এই পড়াটা আমার কাছে খুব আনন্দের ছিল।

তারপরের আড়াইমাস আমি একটা সোলো এগজিবিশান করব বলে কাজ করি। সে-কাজের ভিতর বলা বাহুল্য বর্তমান বিষয়গুলো চলে আসে। ঢুকে পড়ে 'লকডাউন', আমফান, পরিযায়ী শ্রমিকদের কথাও। আমি এতদিন কাজ করলেও কোনো একক প্রদর্শনী করিনি। আসলে আমার নিজেকে ঠিক গ্যালারির শিল্পী বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, দুর্গাপুজোর মাঠের মতো কোনো মুক্ত প্রাঙ্গণে আমার প্রদর্শনী হবে, সেখানে অবশ্যই প্রতিমা থাকবে না। এবার তেমন কিছু করব বলে ভাবিনি, চিন্তা করেছিলাম আমাদের 'চাঁদের হাট'-এর গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীটা করব।

এরকম ভাবনাচিন্তা আর কাজের মধ্যে যখন আটকে ছিলাম তখন খবর এলো এবার পুজো হবে। আমি হয়তো বিলাসিতা

করে পুজো করব না বা অবসরের আমোদে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু মনে পড়ল সেইসব মানুষগুলোর মুখ, যাঁরা আমার এই পুজোর কাজের সহযোদ্ধা। এই কাজের ওপর তাঁদের এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বহু মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। আমি চাই এঁদের সবার মুখে পুজোর কাজের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটুক।

এবছরও আমি সুরুচি সংঘ ও নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজো করছি। বাজেট হয়তো অনেক কম। পুজো এবার দেবতার নয় মানুষের এবং তরঙ্গ—এই দুটো থিমের ওপর আমার এবছর পুজো। যে জিনিসপত্র ব্যবহার করছি তার দাম কম কিন্তু কর্মসংস্থানের জন্য অনেক বেশি লোককে এবার পুজোর কাজে যুক্ত করেছি—তাই অন্যদিকে খরচটা একটু বেশি হবে। উদ্যোক্তাদের সেকথা বলেছি—ওঁরাও সানন্দে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া বিগত পাঁচবছর ধরে নারীর স্বনির্ভরতার জন্য বহু মহিলাকে পুজোর কাজে এবং আমাদের চাঁদের হাট-এর কাজে নিয়োগ করেছি—এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

চিত্র-সৌজন্য লেখক

লেখক বিশিষ্ট শিল্পী, তিনি কলকাতার থিমের পুজোর অন্যতম রূপকার।
sutar.bhabatosh@gmail.com

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাজকুমারী যাবেন শিকারে। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। ওদিকে পর্বতরাজ্য মণিপুরের আকাশে আসন্ন দুর্যোগের আয়োজন। যুদ্ধবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যায় শিক্ষিত পৌরুষদৃপ্ত এই নারীর দেহে শিকারির সাজ। কেমন সেই সাজ?—বুকে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে বন্ধনী। তিনি চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের নায়িকা। একাধারে তিনি পুরুষ ও নারী। তাঁর বর্ম, শিরস্ত্রাণ, বেশভূষা ও অলংকার জ্যামিতিক বিভঙ্গে নির্মিত হলেও সে সাজসজ্জায় নান্দনিক রূপের প্রকাশ—কারণ এ যে নৃত্যনাট্য।

উপাসনা গৃহের অলংকরণ ২০১৯

এ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংগীত ও নৃত্যের টানটান সুতোয় বাঁধা।

সে দিনটা ছিল ৬ মার্চ, ২০২০—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্রের নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে আমি ও আমার ছাত্রছাত্রীরা ব্যস্ত ছিলাম এ নাটকের সাজসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার রূপনির্মাণে। এ কাজ করতে করতে বার বার ভেবেছি ১৯৩৬ -এ 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম অভিনয়ের কথা। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ১৯৩৬-এরও অনেক আগে জোড়াসাঁকো পর্বে নাটকের পোশাক, অলংকার ও মঞ্চসজ্জার কাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সেইসব কর্মকাণ্ডে যুবক নন্দলাল

সহায়তা করলেও নাটক ও নৃত্যনাট্যের নান্দনিক রূপ নির্মাণে নিজস্ব ভাবনা গড়ে তুলছিলেন। ক্রমে পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত এক কবির আকাঙ্ক্ষাকে যথার্থ রূপ দিতে সফল হলেন নন্দলাল বসু। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যখন কালিকলমে সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর এক নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, তখন তাঁরই রচনাকে ভিত্তি করে নন্দলাল একে-একে তাঁর রূপ-কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে চলেছেন। সামান্য কিছু পিসবোর্ড কেটে তার ওপর রঙিন কাগজের নানা আলংকারিক আকার বসিয়ে সৃষ্টি করলেন 'তাসের দেশ' নাটকের বেশভূষার সম্পূর্ণ নতুন আদর্শ। এভাবেই 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের শিকারদৃশ্যের সাজসজ্জার এক নান্দনিক রূপ গড়লেন। রবীন্দ্রনাথের নিত্যনতুন রচনার সঙ্গে-সঙ্গে সমান্তরালভাবে নন্দলাল আর এক সৃষ্টির কাজে মেতে উঠলেন। নৃত্যনাট্যের চরিত্রগুলির যথাযথ পোশাক ভাবনার ক্ষেত্রে একটা কাঙ্ক্ষিত রূপ রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন নন্দলালের কাজে। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে যেমন নানা নৃত্যধারার একটা সমন্বিত রূপ আদর্শ হয়ে উঠেছে, তেমনই সেই নৃত্যধারার পোশাক ও অলংকারের আদর্শ নন্দলাল গড়ে তুললেন নানা দেশ ও প্রদেশের পোশাকের রূপের একটা সমন্বয় ঘটিয়ে যা সবমিলিয়ে হয়ে উঠল এক ব্যতিক্রমী নান্দনিক রূপ। নন্দলাল সৃষ্ট সেই নান্দনিক ধারার শরিক আমরাও প্রতিনিয়ত সেই আদর্শে নিজস্ব কিছু সৃজনভাবনা যোগ করে চলেছি। এ কাজ করতে করতে নন্দলালের আলংকারিক চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ঘটিয়ে সুফল পেয়েছি নানা রবীন্দ্র নাটক ও নৃত্যনাট্যে যেমন 'নটীর পূজা' (২০১২), 'শাপমোচন' (২০১৩), 'শ্যামা' (২০১৪), 'বসন্ত'

শান্তিনিকেতনের পুরোনো দিনের আলপনা

সর্বাঙ্গে ভরা বসন্তের সাজ নিয়ে জনহীন হয়ে গেল। দৈনন্দিন কাজকর্মে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হল। অতিমারি সংক্রমণের দুশ্চিন্তা তীব্র হলেও প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে ডুবে গেলাম নব-নব সৃজন চিন্তায়। অলংকরণ ও

আলপনা নিয়ে আমার নিভৃতচর্চা আরও গভীর হল। অপেক্ষায় ছিলাম এবারের বাংলা বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভের আলপনা দেওয়ার ডাকের জন্য, কারণ উপাসনাগৃহের আলপনার ভাবনায় আমি পাই অন্য ধরণের এক চেতনায় অবগাহনের আনন্দ। বর্ষশেষের আলপনায় শুধু সাদার ব্যবহার এবং নববর্ষে সেই আলপনায় বর্ণপ্রয়োগের ভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন নন্দলাল বসু। কিন্তু না—এবারের পরিস্থিতিতে উপাসনা ও আলপনা কোনোটাই হল না। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাসে উপাসনা ও নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলপনা। আপামর জনসাধারণ আলপনা বলতে জানেন বাংলার ঐতিহ্যময় গ্রামীণ আলপনার কথা। আলপনার কথায় সকলেই পিটুলিগোলায় হাত ডুবিয়ে পল্লিবাংলার আঙুলের টানের স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যান, কিন্তু একজন মানুষ এসে বললেন — "আলপনা হল নৃত্যভঙ্গীর মত"। যে-আলপনাকে আমরা জেনে এসেছি গ্রাম বাংলার ব্রতপালনের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে—যে-আলপনার মূলে ছিল পল্লিরমণীর নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিশ্বাসবোধ, সেই 'আলপনা' সম্পর্কে এই মানুষটি কেন এমন কথা বললেন। তাঁর আলপনার বিশ্বাসবোধ অন্যতর নান্দনিকতার চেতনা সমৃদ্ধ। কীভাবে এই চেতনায় তিনি পৌঁছলেন তা বুঝতে গেলে জানতে হবে শিল্পী হিসেবে তাঁর জীবনের যাত্রাপথ।

অতীতে ফিরে যাই—সেটা ছিল ১৯১৪-র ৩০ এপ্রিল। ১৯০১ -এ রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করার পর কলা ও সংগীত শিক্ষার সূত্রপাতের কথা ভাবছেন। সেই ভাবনাতেই উদীয়মান শিল্পী নন্দলাল বসুকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য নিয়ে

মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু

এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলালের প্রথম শিল্পশিক্ষা শুরু কলকাতা আর্ট স্কুলের ডিজ়াইন ক্লাসে। সেখানে স্টেইন্ড গ্লাস অর্থাৎ রঙিন কাচ কেটে নকশা তৈরির কাজ এবং জয়পুরী দেওয়ালচিত্রের নির্মাণপদ্ধতিও শিখেছিলেন। আর্ট স্কুলে যে-ঘরে বসে কাজ করতেন সে-ঘরে দেখতেন টাঙানো আছে মোঘল, রাজপুত, কাঙড়া ও পারসিয়ান মিনিয়েচার চিত্র। ওইসব ছবির সূক্ষভাব, দক্ষতা, ফিনিশিং ও অলংকরণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অলংকরণের রসে সম্পৃক্ত নন্দলালের মন 'অর্নামেন্টাল ছবি'র কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে আলংকারিক কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

ফিরে আসি ১৯১৪-তে নন্দলাল বসুর সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানের নান্দনিক সজ্জার কথা শুনি তাঁরই মুখে— "এখানকার পাকা 'কারমাইকেল বেদী'র সামনে তখন একটি কাঁচা মাটির বেদী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে ; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন এঁকে, সেই গর্তগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভর্তি করে, পদ্ম এঁকে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা।"—নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেই স্থানটিকে আলপনামণ্ডিত করার কাজ। ১৯০৮-এ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট বৈদিক ভাবনায় আলপনা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন তৎকালীন শিল্পশিক্ষক অসিত হালদার ও তাঁর ছাত্রদল। ১৯১৪-র পর ১৯১৯-এ নন্দলাল এলেও কলাভবনে যুক্ত হলেন শিক্ষক হিসেবে ১৯২০-তে। তখনও বৈদিক রীতিতে মাটির বেদির ওপরে পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেভাবেই আলপনার কাজে হাত লাগালেন নন্দলাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অসিত হালদার ও সুরেন কর। ১৯২৪-এ এলেন পূর্ববাংলার গ্রামের বালবিধবা সুকুমারী দেবী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে কালীমোহন ঘোষের এই আত্মীয়াকে শান্তিনিকেতনের আলপনার দায়িত্বভার দিয়ে আনা হল। সুকুমারী দেবী একইসঙ্গে আলপনা, চিত্রবিদ্যা ও সূচিশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বাংলার গ্রামীণ আলপনার চিরাচরিত মোটিফগুলিকেই বড়ো করে এঁকে নানাভাবে পুনর্বিন্যাস করলেন। বাদ গেল একান্ত ধর্মীয় মোটিফগুলি। ফলে

'তাসের দেশ'-এর পোশাক ২০১৭

ব্রত আলপনার রূপ শান্তিনিকেতনের মাটিতে এক নতুন রূপ নিল। সুকুমারীর সঙ্গে এই কাজে নন্দলালও তাঁর ভাবনা যোগ করতে থাকলেন। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতনের আলপনার নব আদর্শের পথিকৃৎ যিনি হতে চলেছেন তাঁর মনে আলংকারিক ভাবনা কোনদিকে কীভাবে এগোচ্ছিল সে-প্রশ্ন জাগে। ঠিক এখান থেকেই পিছু ফিরে গত কুড়ি বছরে নন্দলালের শৈল্পিক যাত্রাপথটি একবার দেখে নিতে পারি।

১৯০৭-এর শেষ থেকে ১৯০৮-এর প্রথম অংশ জুড়ে ছিল নন্দলালের উত্তরভারত ভ্রমণপর্ব। প্রথমে পাটনা হয়ে কাশী, সারনাথ, লখনউ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি হয়ে গয়া ও বুদ্ধগয়া দিয়ে শেষ হয়েছিল তাঁর ভ্রমণ। তিনি যা দেখতে-দেখতে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে থাকলেন তা হল সারনাথের হিন্দু আর বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে দৈহিক ভঙ্গি ও নকশার প্রয়োগ, লখনউয়ের ইমামবাড়া ও মসজিদের কাচ-বসানো অলংকরণ এবং মোজায়েকের স্থাপত্যনকশা, লখনউ

চিকণের সূক্ষ্ম কারুকাজ ও চিনামাটির বাসনের ওপর মিনার কাজ। স্থাপত্যে, মূর্তিতে ও চিত্রে এইসব অলংকরণ তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে তাঁর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে এক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে লেখেন—"মনে পড়ে আমরা লক্ষ্ণৌতে নবাবের প্রাসাদ দেখেছিলাম? তার নীল দেওয়ালে ছিল সাদা লতাপাতার অলংকরণ এবং আমিও ভুলিনি সেখানে একটি দরজার গায়ে আঙুরলতার খোদাই করা শিল্পকর্ম।"

১৯০৮-এ নন্দলাল আবার বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণভারত ভ্রমণে। প্রথমেই ওড়িশা—সেখানে ভুবনেশ্বর মন্দির, গৌরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও বিন্দুসাগর মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও দেওয়ালগাত্রে মূর্তি এবং ভাস্কর্য-অলংকরণ দেখলেন খুঁটিয়ে। বেতাল-দেউল মন্দিরে নকশাশোভিত ফ্রেমের মধ্যে মহিষাসুরমর্দিনীর তেজোদৃপ্ত দণ্ডায়মান মূর্তি এবং যুদ্ধরত মহিষাসুরের বলশালী উদ্ধত ভঙ্গি তিনি দেখলেন। পরবর্তীকালে তাঁর আঁকা বিভিন্ন দুর্গার ছবির মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটল তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গি ধরে। দক্ষিণভারতের প্রত্যেকটি মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী, গোপুরমের গঠন ও ঘনসংবদ্ধ ভাস্কর্য এবং অলংকরণ, এছাড়া প্রত্যেকটি মন্দিরের সোনার ধ্বজস্তম্ভ গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখলেন। এরপর যেসব মন্দিরের ভাস্কর্য ও অলংকরণ দেখতে-দেখতে চললেন সেগুলি হল শ্রীরঙ্গনাথম, শ্রীরামচন্দ্র, বরদারাজস্বামী, কপালেশ্বর, মহাবলিপুরম, কাঞ্চিপুরম, চিদাম্বরম, মায়াভরম, ত্রিচিনাপল্লি, মাদুরাই, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরী প্রভৃতি। একদিকে এইসব মন্দিরের মূর্তির ভাব ও ভঙ্গি থেকে ভারতীয়

'চিত্রাঙ্গদা' ২০১৬

শিল্পদর্শনের ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ লক্ষ করলেন। পাশ্চাত্য চিত্র ও ভাস্কর্যে মূর্তির এনাটমিকাল গঠনের পরিবর্তে ভারতীয় মূর্তির গড়নে ও অভিব্যক্তিতে একইসঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও নান্দনিকতার প্রকাশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মন্দির ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতাজনিত ঘনত্ব নন্দলালের আঁকা দেবদেবীর চরিত্রে রেখার ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছিল। সর্বোপরি, অলংকরণ যাঁর কামনা, বাসনা ও স্বপ্ন—এই ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ যে তাঁর চিত্তে এক প্রবল উদ্‌বোধন ঘটিয়েছিল সে-কথা অনস্বীকার্য। এসব দেখতে-দেখতে তিনি ক্রমাগত ড্রইং ও স্কেচ করে গেছেন মূর্তি ও স্থাপত্যনকশার গতিপ্রকৃতি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বুঝে নিতে। যেখানে সে-সময়টুকুও পাননি সেখানে ভাস্কর্য-অলংকরণের ওপর কাগজ রেখে পেনসিল ঘষে তার ছাপ তুলে নিয়েছেন। তাঞ্জোরের আলংকারিক ধাতুশিল্প তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল গভীরভাবে কারণ বস্তুর বাস্তবরূপ থেকে আলংকারিক বিস্তার কীভাবে ঘটে তার পথ তিনি পেয়েছিলেন।

বাস্তবরূপের কাঠিন্য সরিয়ে তার আলংকারিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি নকশার সামগ্রিক নির্মাণ কীভাবে ঘটানো যায় তা নন্দলালের মণ্ডনধর্মী কাজগুলিতে আমরা পেয়েছি। এভাবেই নন্দলালের এই ভ্রমণপথ তাঁর ভবিষ্যতের আলংকারিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করেছিল। এই সমৃদ্ধিই শান্তিনিকেতনের আলপনার নব আদর্শ রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯০৭ ও ১৯০৮-এ উত্তরভারত ও দক্ষিণভারত ভ্রমণ ছিল তাঁর স্বেচ্ছায় আত্মানুসন্ধানের পথ। তা-তে সফল ও লাভবান হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ১৯০৯-এ অজন্তার উদ্দেশে যাত্রা তাঁর

অনিচ্ছাতেই শুরু হয়েছিল। ১৯০৯-এর ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে অজন্তার উদ্দেশে রওনা করে দিলেন দুই বিদেশিনী—ভগিনী নিবেদিতা ও লেডি হেরিংহাম। এই দুই মহিলা বিদেশিনী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু ভারতশিল্প পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নন্দলাল ও অসিত হালদারকে অজন্তার গুহাচিত্র নকল করার কাজে পাঠাবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নন্দলাল তখনও জানতেন না যে এই যাত্রা তাঁর শিল্পীজীবনে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।

অজন্তার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল এই ঐতিহ্যময় নান্দনিক শিল্পধারার তিনিও একজন বাহক। অজন্তার ছবি প্রথম দেখেই তাঁর মন্তব্য—"এই গুহাচিত্রগুলি পূর্বজন্মে আমরাই আঁকিয়াছি"। কোনো বিশেষ শিল্পধারার সঙ্গে এই মানসিক নৈকট্য অনুভব করতে পারেন সেই শিল্পীই যখন তাঁর শৈল্পিক বাসনা কোনো শিল্পবৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন তাঁর মনে হয় এ রেখা তাঁরই টানা, এ বর্ণপ্রয়োগ তাঁরই হাতের। অজন্তার ছবিতে নকশার প্রয়োগ, ছবি ছাড়া অন্যান্য প্যানেলে আলপনা সদৃশ সম্পূর্ণ আলংকারিক রচনা এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছবি ও অলংকরণ একে অপরকে জড়িয়ে আছে। অজন্তার ছবি দেখতে দেখতে নন্দলাল অলংকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করলেন। দেখলেন পদ্ম এবং পদ্মের বিভিন্ন আলংকারিক রূপ। অসংখ্য পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়িগুলিকে নিয়ে একটা গতিময় রূপ দিতে কাল্পনিক পদ্মলতার আলপনা আঁকা হয়েছে। এই গতিময়

নকশার সাথে কখনো মানবদেহ, কখনো হাঁস বা অন্যান্য কাল্পনিক পশুপাখিও যুক্ত হয়েছে। এই অলংকরণে হাঁসের ডানা ও পুচ্ছ রূপান্তরিত হয় আলপনার বিভঙ্গে। এমনকি মহিষের দেহাংশ ক্রমশ অলংকৃত হয়ে মিশে যায় অন্যান্য অলংকরণের সঙ্গে। নন্দলাল লক্ষ করেছিলেন যে কোনো বাস্তব রূপকে কীভাবে লীলায়িত করে তোলা যায় নকশার গতি ও ছন্দে। তাঁর অন্তরে অলংকরণ বাসনার ভবিষ্যৎগতি যে দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল তা যেন চতুর্গুণ উজ্জীবিত হয়ে উঠল। জগতের যাবতীয় দৃশ্যরূপ ও তার থেকে জাত উদ্দীপনা এক আলংকারিক বিন্যাসের পথে এগোল।

এভাবেই শান্তিনিকেতনের আলপনা এক আনন্দময় সৃজনশীল ভাবনায় গড়ে উঠতে চলল ১৯২০-র পর থেকে। নন্দলালের অন্তরের কারুবাসনা তাঁর এই ভ্রমণপথের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে একটা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হল, যদিও শিল্পের কোনো পূর্ণতা বা চূড়ান্ত রূপ বলে কিছু হয় না। তা এগিয়ে চলে যুগে-যুগে নানা শিল্পীর শৈল্পিক ভাবনার সংযোজনে। বাংলার ব্রত-আলপনার হুবহু রূপ যে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও মাটিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠবে না তা বুঝেছিলেন সুকুমারী দেবীও যাঁর হাতে সেখানকার আলপনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের আলপনার কাজে যুক্ত ছিলেন সুরেন কর তাঁর নিজস্ব অলংকরণ ভাবনা নিয়ে। ছিলেন অসিত হালদার ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। নন্দলাল এলেন এবং দেখলেন সকলের আলপনা। ছাত্রাবস্থা থেকেই লালিত তাঁর অলংকরণ-বাসনা সমৃদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য দ্বারা। এছাড়াও প্রাচ্যের নানা দেশের যেমন জাভা ও তিব্বতের থাংকা-চিত্রের অলংকরণ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলার আলপনার বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে সুকুমারী দেবী যে আলপনা শুরু করেছিলেন, সে-ও রয়ে গেল শান্তিনিকেতনের আলপনার অন্তরের অন্তস্থলে। নন্দলালের হাতে সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত এই আলপনা হয়ে উঠল ভাবসমৃদ্ধ এক অভিজাত রূপবিন্যাস যার প্রধান অবলম্বন প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অনন্ত রূপ। প্রকৃতির নিজস্ব প্রাণছন্দের গতিপ্রকৃতি ধরে ডিজাইনের মূল সূত্র নির্ধারণ করলেন। একেকটি ফুল, তার পাপড়ি ও বৃন্তের গঠন, পাতার আকার, বিভিন্ন গাছের সামগ্রিক রূপ থেকে শুরু করে পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের প্রতীকী নকশা তিনি গড়লেন।

আলপনার উপকরণ ও পদ্ধতি বা টেকনিকের ব্যাখ্যা তিনি কখনো করেননি। আলপনাকে তিনি দেখেছিলেন অন্তরের আনন্দময় অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে। তার সঙ্গে শূন্য জমিতে আলপনার নির্মাণভাবনা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিলেন। আলপনার অন্তর্নিহিত সাবলীল গতির ওপর জোর দিয়ে তিনি বললেন— "গতিই হল আলপনার প্রাণ"। আরও এগিয়ে বললেন— "আলপনা হল নৃত্যভঙ্গীর মত"। এভাবেই শান্তিনিকেতনের আলপনা হয়ে উঠল শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত মন ও হাতের মার্জিত রূপ যাতে আছে অসীম বিস্তারের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা দেখেই তাঁর দুই কন্যা গৌরী ভঞ্জ ও যমুনা সেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আলপনার ভার। এঁরা পিতার আদর্শে দীক্ষিত এবং সেই শিক্ষাদর্শে শিল্পচর্চার পরিবেশে আলপনাকে চিত্রের মতোই এক উচ্চস্তরের শিল্পে উন্নীত করলেন। অন্যান্য শিল্পশিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সেই ধারাকে বহন করেছিলেন। আমরাও সেই

এস বি পার্ক, কলকাতার দুর্গাপুজোয় লেখককৃত আলপনা

পথে চলেছি আর চেষ্টা করছি এই শিল্পধারায় নিজস্ব ভাবনা যোগ করতে কারণ নন্দলাল বসু বলেছিলেন ঐতিহ্যজ্ঞান এবং মৌলিকত্বই শিল্পীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১৯২০-তে নন্দলাল এসে শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার পীঠস্থান কলাভবন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজ ২০২০। এই একশো বছরে এখানের শিল্পধারায় অনেক জল গড়িয়ে গেলেও আমরা কেউ-কেউ শিল্পাচার্যের সেই পথ বার-বার প্রদক্ষিণ করেছি। ২০২০-র অতিমারির আবহের অলস সময় নিয়োজন করেছি সেই কাজেই। সংক্রমণের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। মে মাসের শেষে যখন নিয়ন্ত্রণবিধি শিথিল হতে শুরু করল তখন নির্দেশ এল যে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা উপাসনাগৃহ বুধবার খুলে দেওয়া হবে উপাসনার জন্য। সেখানে পূর্বনির্মিত আলপনার উপরেই বর্ণলেপন করতে হবে। সেদিন নিস্তব্ধ মন্দিরের দরজা খুলতেই স্যানিটাইজার প্রয়োগের তীব্র গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। দেখলাম স্যানিটাইজারের সাদা আস্তরণ প্রায় ঢেকে দিয়েছে আগের আলপনাকে। এ আলপনা মুছে দিয়ে নতুন আলপনা সৃষ্টি করা যেতেই পারত, কিন্তু সে নির্দেশ নেই। সুতরাং তার উপরেই বর্ণলেপন করে কিছুটা উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনলাম।

এরপর এল ৭ আগস্ট, ২০২০ অর্থাৎ ২২ শ্রাবণ—কবির মৃত্যুদিবস। এ দিনের উপাসনায় এই শোকাবহ দিনটির তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে শুধু সাদা দিয়ে আলপনা দেওয়ার রীতি চলে আসছে দীর্ঘদিন। এ বছর এ দিনটিতে সে রীতি পালিত হল না। উপাসনা হল সেই পুরোনো রঙিন আলপনা দিয়েই।

কোভিড ১৯-এর সংক্রমণের কোনো প্রভাব শান্তিনিকেতনে এতদিন পড়েনি। অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করল অতিমারির প্রথম সংক্রমণ। জানি না এর ভবিষ্যৎ কী বা কতখানি হবে এই আশ্রমে। এ-ও জানি না অবস্থা স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত বিশ্বভারতীর নানা উৎসব অনুষ্ঠান আদৌ পালিত হবে কিনা অথবা পালিত হলেও তা কি শুধুই নিয়মরক্ষা হবে? হয়তো বিপরীত দিকে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে অতিমারির সংক্রমণে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনে এইসব নান্দনিক চর্চা কি অবান্তর নয়?

জীবন বার-বার বিপর্যস্ত হবে নানা সমস্যা ও বাধায়, কিন্তু আমরা লক্ষ করব যে প্রকৃতি তার চিরন্তন আনন্দ প্রবাহ সচল রেখেছে। গত মার্চ থেকে শান্তিনিকেতনে একে একে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এলো তার অপরিমেয় রূপের সম্ভার নিয়ে। শরৎও এসে গেল তার অমল মহিমা নিয়ে। তাই নান্দনিকতার যাত্রাপথ কখনো ব্যাহত হবে না। আলপনার গতি রুদ্ধ হবে না—তার ছন্দপতন হবে না। যে 'মাস্টারমশাই' তাঁর জীবনের নানা যাত্রাপথ অতিক্রম করে সৌন্দর্যের এক নতুন আদর্শ গড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই পথচলা আজও থামেনি। তিনি যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন আমরাও সেই পথের পথিক। তাই থেমে থাকবে না নান্দনিকতার সেই চর্চা—চলবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

ঋণ:

১। *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, পঞ্চানন মণ্ডল

২। *The Master's Hand: The Artistic Vision of Nandalal Bose* (Pundole's Gallery)

সকল আলোকচিত্র লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত

লেখক বিশ্বভারতীর শিক্ষাসত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, তিনি বিশিষ্ট শিল্পী এবং ২০১৯-এ বেহালা এস বি পার্কে দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

subharanjanm23@gmail.com

উপরে বাঁধন দাস ও দুই দর্শনার্থী (২০০২),
নীচে প্রতিমা বানাচ্ছেন আশিস ঘোষ

আশিস ঘোষ

শান্তিনিকেতনে বনেরপুকুরের এই হীরালিনী দুর্গোৎসব শুরু করেছিলেন আমার শিক্ষক ও আমার স্ত্রী-র দাদা সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় বাঁধন দাস। ২০০১-এ আমি তখন শান্তিনিকেতনের দূরদর্শনের অফিসে আবার বদলি হয়ে ফিরে এসেছি, একদিন বাঁধনদা আমায় বললেন আদিবাসীদের নিয়ে একটা দুর্গাপুজো করলে কেমন হয়। শান্তিনিকেতনে বাঁধনদার এই জমি-বাড়িটা ছিলই আর স্মৃতিতে ছিল নিজের দেশের বাড়ির দুর্গাপুজোর দিনগুলো। আমার সঙ্গে আদিবাসীদের

টেরাকোটার দুর্গা

ভালো যোগাযোগ ছিল, একটা স্কুলও চালাতাম ওদের নিয়ে। প্রায় আমাদের পুজোর সময়কালে ওদেরও একটা পরব হয়— বেলবরণ উৎসব। ওই সময় ওরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নাচগান করে। তাই বাঁধনদার প্রস্তাব শুনে আমি ওদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়ার কথা বললাম।

ক-দিন পর বনেরপুকুরডাঙা, ফুলডাঙা ও বল্লভপুরডাঙা— এই তিনটি গ্রামকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসলাম। তারা সানন্দে রাজি হল। তারপর বাঁধনদা কলকাতা থেকে টেরাকোটার একটা দুর্গামূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলেন। পার্থ দাশগুপ্ত, পল্লব দাস ও আরও কয়েকজন বাঁধনদার ছাত্র স্বেচ্ছায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানে আনার পর রং করা হল। আমি তার

আগে মূর্তি যেখানে বসবে সে-জায়গা বা অন্যান্য অনেক কাজ সেরে রেখেছিলাম।

প্রথম বছর পুজো খুব ছোটো করে হলেও আনন্দ হয়েছিল অনেক। আদিবাসীরা ম্যারাপ বাঁধা, মণ্ডপ তৈরি প্রভৃতি কাজ সানন্দে সাঙ্গ করল। পাশাপাশি নাচ-গান-বাজনা তো ছিলই,

কলাবউ স্নানের পথে

ছিল ওদের অনেক হাতের কাজের পসরা। প্রথম বছরের সাফল্য আমাদের দ্বিতীয় বছরের পরিকল্পনায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাই আমরা একটু বড়ো করে ভাবলাম বিষয়টা নিয়ে। একটু আগে থেকে পরিকল্পনা করে ঝাড়খণ্ডে একই উপজাতির মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কারণ, ঝাড়খণ্ডের ওই উপজাতিদের মধ্যে সনাতনী ধারার সংগীতচর্চা এখনও স্বধারায় বহমান। ওখান থেকে একটা পঁচিশজনের দল এসে চারদিনের উৎসবে যোগ দিল। স্থানীয় বাউলরাও উৎসবে যোগ দিতে আগ্রহী হয়।

দ্বিতীয় বছর কাঠের ঠাকুর বানানোর কথা হল। কাঠের কার্ভিং করায় আমরা ততটা দক্ষ ছিলাম না। তাই রবি ভাস্করকে বিষয়টা দেখতে বললাম। ও ক-দিন দেখার পর বলল—ও-কাজে সে-ও অভ্যস্ত নয়। তাই আমি শেষমেশ তিনজন আদিবাসী ছেলেকে নিয়ে একমাসের মধ্যে ওই আঠেরো ফুট বাই এগারো ফুট মাপের টোটেমগুলো বানিয়ে ফেললাম বাঁধনদার পরিকল্পনা মাফিক। একমাস পরে বাঁধনদা সেই কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন—কারণ বিষয়টা ওঁর আশাতীত ছিল। তারপর উনি রং করার দায়িত্ব নেন। হিংসাবিরোধী বার্তা দেওয়ার জন্য আমরা এ বছর থেকে দেবীর হাতে কোনো অস্ত্র রাখিনি। গ্রামের আশেপাশের অনেক আদিবাসীরা খড়ের কাজ করল। শুরু হল আদিবাসীদের নাটকও। পুজোর উৎসবও খুব ভালো হল।

কিন্তু অঘটন নেমে এল ২০০২-এর ডিসেম্বরে। বাঁধনদা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে চলে গেলেন। পুজো নিয়ে একটা অনিয়শ্চয়তা তৈরি হল। কারণ, বাঁধনদা পুজোর মূল খরচ জোগাতেন। আমাদের পুজোয় তো কোনো চাঁদা তোলা হয় না। চারদিনের পুজোর খরচ বাদেও থাকে যেসব আদিবাসীরা আসছে তাদের খাওয়া ও অন্যান্য খরচ। আমাদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হলেও কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি।

২০০৩-এ আবার মূর্তি পালটানো হল। এবার লোহার মূর্তি। শিক দিয়ে, কোথাও পেটাইয়ের কাজ করে, কোথাও রিপিট করে তৈরি সে-মূর্তিটা একটু অন্যরকম। আগের থেকে পুজোও অনেক জমে উঠল। বিশ্বভারতীর আদিবাসী ছাত্ররাও নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেছিল।

মাটির দুর্গা

২০০৪-এ বানালাম বাঁশের মূর্তি। আদিবাসীদের সঙ্গে ওই বাঁশ বুনে, সেটাকে একটা ত্রিমাত্রিক আকার দিয়ে, রং করে প্রতিমা বানানো হল। ২০০৫-এ বানাই খড়-মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি—তবে একটু বিশেষত্ব তা-তে ছিল। এই যে মোট পাঁচটা মূর্তি বানানো হল, সেগুলিকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এখন আমরা ব্যবহার করি। অবশ্যই চেষ্টা করি সাজে বা অন্য কিছুতে প্রত্যেক বছরই যাতে কিছু বদল আনা যায়। যেমন গত বছর (২০১৯-এ) ছিল লোহার মূর্তি, এবার বাঁশের মূর্তিটা পুজো হওয়ার কথা।

তবে বাঁধনদা মারা যাওয়ার পর থেকে দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে এসে যখন পড়ে তখন মাঝে-মাঝে অবশ্যই মনে হত, এত চাপ সামলাব কী করে! অর্থব্যয় তো আছেই, পাশাপাশি দিনদিন উৎসব কলেবরে এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে তা সামলানো খুবই শক্ত। আমার স্ত্রী ও অন্যান্যরা সাহায্য করলেও সে-চাপ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু যখনই বন্ধ করার কথা ভাবি তখন আদিবাসী গ্রামের লোকেরা এসে অনুরোধ করে, বলে এই পুজো

বন্ধ করলে ওরা আনন্দের সুযোগ হারাবে। ওদের কথা শুনে আবার নতুন উদ্যমে লেগে পড়ি পুজোর কাজে।

বাঁধনদারও উদ্দেশ্য ছিল পুজোর মাধ্যমে একটা উৎসবের পরিমণ্ডল তৈরি করে আদিবাসীদের হারিয়ে যাওয়া নাচ-গান-বাজনাগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনা। দীর্ঘদিন এই পরিবেশে থেকে চর্চা ও সমঝদারের অভাবে সেগুলোতে বেশ ভাটা পড়েছিল। পুজোটা শুরু হওয়ার পর থেকে সে-বিষয়টা যে

উৎসবের আমেজ

ভালোভাবে করা গেছে তা এখন আর কারও অজানা নেই। সে-টানেই দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসেন, ওদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন। ওরাও নাচ-গান-বাজনার পাশাপাশি নিজেদের হাতে তৈরি পসরা বেচে—কিছু উপার্জনও হয়। ২০০৪-এ এভাবেই হাটের শুরু হয়েছিল একদিন এই সোনাঝুড়িতে। তাছাড়া পুজোর দিনগুলোতে সাইকেল রেখে ওরা যে উপার্জন

করে সেটা গঠনমূলক কাজেই ওরাই ব্যয় করে। পুজো শেষ হলে একটা খেলার আয়োজন করা হয়। আগের চারদিন নানা লোকের আনাগোনায় এলাকা যে নোংরা হয়, তা পরিষ্কার করার প্রতিযোগিতা। পুরস্কারও থাকে। খুব আনন্দের সঙ্গে সে-খেলায় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা মেতে ওঠে।

পুজো করা ও আদিবাসীদের হারিয়ে-যাওয়া সংস্কৃতি ফেরানোর লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা এবার কুড়ি বছরে। এতদিন মানুষের অংশগ্রহণ এবং তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাফল্যের সূচক নির্দেশ করে। কিন্তু এ বছর এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আমরা পুজো করলেও অনুষ্ঠান না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যিনি বিগত বছরগুলিতে পুজো করে আসছেন তিনি এবারও পুজো করবেন, এবারও সপ্তমীতে ঘট ভরতে যাওয়া হবে, পুজো-অর্চনা চলবে অষ্টমী-নবমী জুড়ে, বিসর্জনের বাজনা বাজবে দশমীতে—কিন্তু থাকবে না সেই ধামসা-মাদলের বোল-ঝুমুরের আওয়াজ বা কোনো সাঁওতাল নাটকের উচ্চকিত সংলাপ।

আলোকচিত্র: সোমনাথ ঘোষ ও চিত্রা ঘোষ

লেখক বিশিষ্ট শিল্পী, তিনি প্রাক্তন দূরদর্শন কর্মী।